স্বদেশ ভাবনা

কাজী সিরাজ

সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার ও রাজনীতিবিদ কাজী সিরাজ জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বিখ্যাত চিওড়া কাজী পরিবারে। তাঁর পিতা মরহুম কাজী আফাজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন সরকারি চাকুরে। মা মরহুম সালেহা খাতুন ছিলেন ধার্মিক ও সুগৃহিণী।

কাজী সিরাজ মূলত রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছাত্রজীবন থেকেই। তিনি ১৯৬৫ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর একাধারে চট্টগ্রাম শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক, জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন।

দ্বিতীয় ফ্লাপে দেখুন

www.pathagar.com

কাজী সিরাজ একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ২ নম্বর সেক্টরের ২ নম্বর সাব সেক্টরে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'স্বাধীন বাংলা' পত্রিকারও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রাদেশিক কাউন্সিলর ছিলেন। কিছুদিন 'পূর্ব পাকিস্তান রোড ও বিল্ডিং শ্রমিক ইউনিয়ন' ও 'পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস শ্রমিক ইউনিয়নের'ও তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পর কাজী সিরাজ রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি এখন দৈনিক দিনকাল-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। স্ত্রী অধ্যাপিকা শাহ্‌রিয়া আকতার ভুলু ও দু'কন্যা সোমা, বিথী এবং পুত্র জয়কে নিয়ে তিনি অত্যন্ত সুখী।

প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বদেশ ভাবনা

কাজী সিরাজ

মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা, ২০০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

মোমিন উদ্দিন খালেদ

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার
৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য

১০০ টাকা মাত্র

ISBN

984-8613-89-7

Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4, Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.pathagar.com

সূচি

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-১ ❐ ৭
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-২ ❐ ১১
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৩ ❐ ১৬
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৪ ❐ ২১
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৫ ❐ ২৭
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৬ ❐ ৩৩
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৭ ❐ ৩৯
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-৮ ❐ ৪৫
বাংলাদেশ রুখে দাড়াও-১ ❐ ৪৯
বাংলাদেশ রুখে দাড়াও-২ ❐ ৫৪
বাংলাদেশ রুখে দাড়াও-৩ ❐ ৬০
আর কোন বিকল্প ছিলো না ❐ ৬৬
সরকারের সাফল্যের কথা ওরা বলে না ❐ ৬৮
'সাতশ ইঁদুর মেরে' শেখ হাসিনা এখন 'বিড়াল তপস্বী' ❐ ৭২
সুরঞ্জিত বাবু সেনাবাহিনীর কাছে নির্বাচন দাবি করলেন কেন? ❐ ৭৪
দ্রুত বিচার আইনের বিরোধিতা কেন ❐ ৭৭
জোট সরকারের এক বছর ❐ ৮০
সেনা অভিযানে স্বস্তি জনমনে ❐ ৮৩
কালনাগিণীর ফণা ❐ ৮৬
জাতির উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ❐ ৯২
যৌথ অভিযান সফল হোক ❐ ৯৫
লীগের পরিকল্পিত সন্ত্রাস ❐ ৯৮
যত ফুল তত আশা ❐ ১০১
চরিত্র হননের রাজনীতি ❐ ১০৫
জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশ ❐ ১১০
জিয়া ঃ মরণ যাকে জাতির কাছে আরো আপন করেছে ❐ ১১৪
একুশের বিশ্বমর্যাদা ❐ ১২২
হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচি উসকানিমূলক ❐ ১২৫

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ-১

দেশ শাসনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত কোনো বিকল্পের সন্ধান এখনো মেলেনি। শুধু উন্নত দেশে নয়, উন্নয়নশীল দেশসমূহেও তাই গণতন্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন চলছে অব্যাহতভাবে। এ ব্যবস্থায় জনগণের পছন্দে গঠিত হয় একটি সরকার। এতে একটা দেশে কোনো সরকারই সে দেশের শেষ সরকার বলে বিবেচিত হয় না। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কাজের মাধ্যমে জনচিত্ত জয় করতে পারলে ক্ষমতাসীনরা টিকে যায় আর গণরোষে পতিত হলে সরকারের পতন ঘটে। দল-বদল হয় সরকারের। গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশ ও জাতি সরকার বদলের জন্য কখনো অগণতান্ত্রিক বা অন্ধকার পথ অনুসরণ করে না। কিন্তু আমাদের দেশে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ বেশ জোরালো। শুধু শেখ হাসিনার আমল নয়, তার পিতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেও এ দলটির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিল। কী ক্ষমতায়, কী ক্ষমতার বাইরে- সর্বদাই তাদের আচরণ রুক্ষ, মারমুখী। রাজনীতিতে সুবচন, অন্যের সঙ্গে সদাচার, প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের প্রতি নতজানু হওয়া তাদের অভিধান থেকে নির্বাসিতই বলা চলে।

ওরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু চর্চা করে স্বৈরতন্ত্রের। ওরা নিজেদের অধিকার ভোগ করে, কিন্তু খর্ব করে অপরের অধিকার। ওরা জোর করে হলেও ওদের কথা শুনতে ও মানতে অপরকে বাধ্য করতে চায়, কিন্তু অপরের ন্যায্য কথারও কোনো মূল্য দেয় না। পরমতের প্রতি তারা বড়ই অসহিষ্ণু, কিন্তু নিজেদের প্রশ্নবিদ্ধ, বিতর্কিত মত চাপাতে চায় জবরদস্তিমূলকভাবে। দেশের নিয়ম-প্রথাতো বাদ, আইন-কানুন এবং সংবিধানেরও কোনো পরোয়া করে না তারা। তাদের কথাই যেন আইন, তাদের হুকুম তামিল করতে যেন সকলে বাধ্য। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য এত সমালোচিত তারা, তবু কিছুই গায়ে মাখায় না। দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথে এ এক বিরাট অন্তরায়, দুর্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতা। এই অনভিপ্রেত মানসিকতা আওয়ামী লীগ পরিহার না করলে তাতে তারাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, দেশ ও জাতিও গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে।

www.pathagar.com

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা দেশে বহুদল, বহুমত থাকা স্বাভাবিক। স্ব স্ব মতাদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল দলের থাকে নিজ নিজ কৌশল। 'রণনীতি' বা রাজনীতি-আদর্শ প্রায় স্থির থাকলেও প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক মোকাবিলায় 'রণকৌশল' বা কর্মপন্থা চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। কোনো দলের কর্মকৌশল যদি পেশীশক্তি বা অস্ত্রনির্ভর হয় সে দল গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল বলে আর বিবেচনা করা যায় না। সে দলের কর্মকাণ্ড যদি দেশ ও জাতির স্বার্থ-বিনাশী হয়, তখন তাদের দেশপ্রেমও প্রশ্নবোধক চিহ্ন দ্বারা বন্দী হয়ে যায়। পূর্ব ইতিহাস না টেনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে আজ অব্ধি আওয়ামী লীগের চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এ দলটির কাছে গণতন্ত্রানুরাগের চেয়ে ক্ষমতার লিপ্সা তীব্র, স্বজাত্যবোধের চেয়ে পরদেশপ্রিয়তার প্রাধান্য বেশি।

সত্তরের নির্বাচনে স্বজাত্যবোধের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছিল। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এককেন্দ্রিক, বিজাতীয় শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বঞ্চনা, প্রতারণা এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। ওই ঐক্যবোধ গড়ে ওঠাকে 'ন্যাচারাল গ্রোথ' হিসাবে বর্ণনা করা যায় নির্দ্বিধায়। অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বিকল্প না থাকায় আওয়ামী লীগ সে সুবিধাটা 'ক্যাশ' করেছে। পাকিস্তানী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই ভূখণ্ডের সকল মানুষের সমচিন্তা, মিসট্রাস্ট, কমন ক্ষোভ ও ক্রোধকে পুঁজি করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অবিশ্বাস্য সাফল্য লাভ করে। এভাবেই তারা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার আইনগত ভিত্তির অধিকারী হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, সে অধিকার প্রাপ্তি ছিল পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সত্তরের সেই নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। কারণ সে নির্বাচনটি হয়েছিল পাকিস্তান সংবিধানের অধীনে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দেয়া লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের আওতায়।

মাওলানা ভাসানীসহ এদেশের বাম প্রগতিশীলরা (যারা চীনপন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন) বলেছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে' পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের দ্বন্দ্ব জাতীয় দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্ব মীমাংসাযোগ্য নয়। স্বাধীনতাই এর একমাত্র ফায়সালা। আর এ জন্য 'গোলটেবিল-লম্বা টেবিল' আলোচনা বা পাকিস্তানীদের পাতা ফাঁদ— নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পথ নয়, যুদ্ধই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু শেখ মুজিব এবং মস্কোপন্থী মিত্ররাসহ আওয়ামী লীগ সে কথা কানে তোলেনি। তারা চেয়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই খুঁজে নিয়েছিল সংকট ও দ্বন্দ্ব নিরসনের একমাত্র সূত্র। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে

www.pathagar.com

খোয়াব দেখেছিলেন তা পূরণ হয়নি। তার এ লিপ্সাই গোটা জাতিকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। একাত্তরের ১৯ মার্চও তিনি জাতিকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে। অর্থাৎ ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই পাকিস্তানের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন।

এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার একটা সমঝোতাও হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ সকাল ১১টায় বর্তমান বঙ্গভবন, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাউসে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় সে সমঝোতা হয়। এ ব্যাপারে রিচার্ড সিসন এবং লিও ই রোজ তাদের যৌথভাবে লেখা গ্রন্থ 'ওয়ার এন্ড সেসেশন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এন্ড দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ' গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "দুই নেতা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। বৈঠক শেষে মুজিব একজন সিনিয়র সামরিক অফিসারকে জানালেন যে, তিনি এবং ইয়াহিয়া এগারজন মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ ছয়জন আসবেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং অপর পাঁচজন আসবেন পশ্চিম পাকিস্তান হতে- পিপিপি থেকে তিনজন ও দুইজন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খান) থেকে।" প্রবীণ সাংবাদিক মাসুদুল হক এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন তার বহুল প্রচারিত গ্রন্থ 'বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন'-এর ১৫৫ পৃষ্ঠায়।

শেখ মুজিবুর রহমান যে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এমন একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারেন বোদ্ধাজনরা তা অনুমান করেছিলেন ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের গোপন বৈঠক থেকে। ১৯৭০ সালের নবেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর পিকিং থেকে ফেরার পথে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসেছিলেন। গভর্নর এহসান এবং প্রাদেশিক সরকারের পরামর্শে শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে তিনি রাওয়ালপিন্ডি চলে যান। ক'দিন পরই তিনি ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেন। '৭০ সালের নবেম্বরের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তিনটি গোপন বৈঠক করেন। আমলা-রাজনীতিবিদ জি. ডব্লিউ চৌধুরী এ তথ্য সন্নিবেশ করে তার রচিত গ্রন্থ 'অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি'তে উল্লেখ করেছেন, "..... ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে নবেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তিনটি গোপন বৈঠক সর্বাধিক আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। অল্প শীতের শুরুতে ঢাকার বাইরে আবহাওয়া ছিল খুবই চমৎকার এবং প্রেসিডেন্ট ভবনের সম্মেলন কক্ষের ভেতরের চিত্রও তার চেয়ে কম চমৎকার

www.pathagar.com

ছিল না। মুজিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সংসদে পেশের পূর্বে তার খসড়া শাসনতন্ত্র দেখাবেন। তিনি নাকি ইয়াহিয়া খানকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার ছয় দফা কার্যক্রম দেশকে বিভক্ত করার জন্য ছিল না এবং ইয়াহিয়ার পাঁচ দফা- যেমনটা এলএফও তে আছে তা এবং তার নিজের ছয় দফা- এ উভয়টাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে স্থান পাবে। মুজিবের সঙ্গে তিনটি বৈঠকের পর ১৯৭০ সালের ৩ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান আমাকে ডেকে পাঠান এবং উল্লসিতভাবে বলেন যে, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা ও পরিকল্পনা কখনোই এক ছিল না। মুষ্টিমেয় দালাল তথা রাজাকার-আলবদর-আল শাম্‌স ছাড়া সমগ্র জাতির চোখের তারায় ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন, প্রাণে ছিল স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াইয়ের দৃঢ়প্রত্যয়। অপরদিকে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা- যে মীমাংসা তার মাথায় পরাবে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের মুকুট। অথচ তা কখনোই সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের লালসা ও নেশায় তিনি এতোটাই বুঁদ হয়েছিলেন যে, তিনি অনুধাবন করতে পারেননি স্বাধীনতার দাবিতে সমগ্র জনগণের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র গড়ে উঠেছে তা অবিনাশী। তা ছিন্ন করার দানবীয় বা অলৌকিক কোনো শক্তি তার হাতে নেই, এ ব্যাপারে তিনি অক্ষম ও অসহায়। তিনি বুঝতে পারেননি যে, পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে তার এবং তার দলের দ্বন্দ্বটাই এখন আর প্রধান দ্বন্দ্ব নয়, দ্বন্দ্বটা এখন পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে এই ভূ-খণ্ডের সমগ্র জনগণের। এ দ্বন্দ্ব ইয়াহিয়া-মুজিব, ভুট্টো— মুজিব বা ইয়াহিয়া-ভুট্টো এবং মুজিব-তাজুদ্দিনদের আপস আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা হওয়ার পর্যায়ে আর নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই এর একমাত্র সমাধান। আর এ জন্য প্রয়োজন পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক একটি জাতীয় যুদ্ধের। তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে জাতিকে রাখেন ঘোরের মধ্যে। ফলে একটি হিংস্র সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ন্যূনতম প্রস্তুতিও গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি জাতি।

পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষা করে তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রাণান্ত প্রয়াসের কথা নতুন প্রজন্মতো দূরের কথা, যাদের বয়স হয়েছে তারাও অনেকে জানেন না আড়ালের সেসব কাহিনী। আওয়ামী লীগ দাবি করে তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে, শেখ মুজিবই বাংলাদেশের স্রষ্টা। স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যের কৃতিত্ব ও অবদান তারা স্বীকারই করতে চায় না। অথচ প্রকৃত ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ ২

শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। একথা কেউ কখনো বলেনওনি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সকল কৃতিত্ব ও অবদান শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বলে যে দাবি করা হয় তাও সত্য নয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং বাংলাদেশকে তাদের দখলে রাখার অভিযান শুরুর আগ পর্যন্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কোনো স্পষ্ট ভূমিকা ছিল না। এ ব্যাপারে শেখ মুজিব এবং তার দলের ভূমিকা রহস্যাবৃত ছিলো না, ছিলো অনেকটাই প্রকাশ্য। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষী-সাবুদে সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা পাকিস্তান অটুট রেখেই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিলো শত্রুভাবাপন্ন- অনেকটা 'সাপে নেউলে'।

পাকিস্তান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ অবস্থান এবং ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার আগে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এবং এদেশের বাম-প্রগতিশীলদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি। তখন বাম-প্রগতিশীলরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশ ছিল পিকিং লাইনের অনুসারী, অপরাংশ মস্কো লাইনের প্রতি অনুগত। সাধারণের কাছে এরা পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী বলে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ ছিল না বলে তারা কাজ করতো গোপনে অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ঐক্যবদ্ধ থাকলেও পিকিংপন্থীরা ছিল বহুধা বিভক্ত। তবে পিকিংপন্থীদের অনেকে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)'র সঙ্গে প্রকাশ্যে কাজ করতো। পিকিংপন্থীদের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মোস্তফা জামাল হায়দার, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আবদুল্লাহ্-আল নোমান প্রমুখ সর্বদাই মওলানা ভাসানীর ন্যাপ এবং কৃষক সমিতির সঙ্গে প্রকাশ্যে জড়িত ছিলেন। তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন ছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি। স্বাধীনতার পর তা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট

www.pathagar.com

পার্টি (লেনিনবাদী) নাম ধারণ করে। সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আবদুল হকের নেতৃত্বে চীনপন্থী বলে পরিচিত আরো তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি, সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির অস্তিত্বও ছিল। ব্যাখ্যা ভিন্ন থাকলেও এ সকল পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যার যার রণনীতি ও রণকৌশল অনুযায়ী ভূমিকা রেখেছে। মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহ-মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ধামাধরা বি-টিম হিসেবেই সর্বদা কাজ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ শুরুর আগে তাদেরও কোনো ভূমিকা ছিল না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মওলানা ভাসানীর অবস্থান ও ভূমিকাই ছিল সর্বদা স্পষ্ট-স্ফটিকের মতে পরিষ্কার। তিনি ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা। তাকে বাংলাদেশের এ যাবৎকালের সকল নেতার নেতা বলেও অনেকে অভিহিত করেন। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রিভূত এককেন্দ্রীক বিজাতীয় শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানুষের বনিবনা হবে না, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অনেক আগেই। তখন তিনি লিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে দলটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটিই ছিল পাকিস্তানের প্রথম কার্যকর বিরোধী দল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীই প্রতিবাদের ধ্বনি তোলেন। তার কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের' পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম, শেখ মুজিবুর রহমান সকলেই তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তানের' দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সকল নেতাই ছিলেন মওলানা ভাসানীর নীতি ও অবস্থানের দৃঢ় সমর্থক।

কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তনের পর পরই অবস্থা পাল্টে যায়। সোহরাওয়ার্দী তার অবস্থান থেকে সরে যান। তখন'পূর্ব-পশ্চিমের' বিরোধ আরো প্রকট আকার ধারণ করে এবং পররাষ্ট্রনীতি আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরোধের ফলে আওয়ামী লীগই ভেঙে যায়।

পরিবর্তনের আগে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডা. খান সাহেবকে হাত করেন এবং প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ডা. খান রিপাবলিকান

www.pathagar.com

পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির অধিকাংশ সদস্য রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করে ফেললে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ ও প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সেই সুযোগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টি কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং তার কৃষক প্রজা পার্টির নেতা মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ঢাকায় ভুখা মিছিলে গুলি চালিয়ে তিন জনকে হত্যা করার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে যায়। গভর্নর শেরে বাংলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ৫ সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিরাট এক জংগী মিছিল শেষে গর্ভনরের আমন্ত্রণ নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। তাতে দলীয় সভাপতি মওলানা ভাসানীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। মওলানা সাহেব সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী পদে মনোনীত করেন। ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কফিল উদ্দিন চৌধুরী উপদল)'র মন্ত্রীদের নিয়ে শপথ নেন এবং 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমানও সেই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর মানুষ আশা করেছিল যে, এবার 'পূর্ব পাকিস্তানের' আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া পূরণ হবে এবং সকল প্রকার বৈষম্য, বঞ্চনা ও নিগ্রহের অবসান ঘটবে। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে আওয়ামী লীগ 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ ছিল সোচ্চার, সেই দলের প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনতো 'পূর্ব পাকিস্তানকে' দেয়া হয়েই গেছে, বাকি ২ পার্সেন্ট আমি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, তাও দিয়ে দেয়া হবে। মওলানা ভাসানীর দাবি, প্রতিবাদ কোনো কিছুকেই আমল দিলেন না লীগের ক্ষমতাসীনরা। আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের মুখেও একই রা'। তারাও প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন, আমরা যখন

www.pathagar.com

ক্ষমতা পেয়েছি, স্বায়ত্তশাসনের আর দরকার কী? আর এতো দাবি-দাওয়াই বা কিসের!

কিন্তু কিংবদন্তী নেতা মওলানা ভাসানী অবনত হননি, আত্মসমর্পণ করেননি। দাবিতে তিনি অটল থাকলেন এবং ওই সময় স্বাক্ষরিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো-সেন্টো চুক্তি এবং বাগদাদ প্যাক্টসহ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাধার অন্যান্য চুক্তি ও সমঝোতার তীব্র বিরোধিতা করে দলীয় সরকারের বিরুদ্ধেই কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসেবে চিহ্নিত করে 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বার্থ রক্ষায় তার পূর্ব অবস্থান বহাল রেখে ১৯৫৭ সালের ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের সন্তোষস্থ কাগমারীতে আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির বৈঠক ও সম্মেলন আহ্বান করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয় ৬ ফেব্রুয়ারি, সম্মেলন হয় ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি। ঐতিহাসিক সেই কাগমারী সম্মেলনই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে দিয়েছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা মওলানা ভাসানী তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানের' সঙ্গে থেকে পূর্ব পাকিস্তানীরা কখনো তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে না। পৃথক আবাসভূমি ছাড়া এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তি নেই। তাই পশ্চিমের উদ্দেশে বলেছিলেন 'আসসালামু আলাইকুম'।

ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর উদ্বোধনী ভাষণটিও ছিল ঐতিহাসিক। সেই ভাষণে 'পূর্ব পাকিস্তান', এই ভূখণ্ডের জনগণের প্রতি তাঁর দরদ এবং অধিকার আদায়ে জনগণের প্রতি দিক-নির্দেশনা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি সংস্থা, বাগদাদ চুক্তি সংস্থার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় কয়েকঘণ্টা ভাষণ দেন। 'পূর্ব পাকিস্তানের' আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জোরালো দাবিও উত্থাপন করেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদ তার 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫' গ্রন্থে মওলানা ভাসানীর সে ভাষণ উল্লেখ করেছেন এভাবে- "পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দিলে এবং সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সংখ্যাসাম্য নীতি পালিত না হইলে 'পূর্ব পাকিস্তান' 'আসসালামু আলাইকুম' বলিবে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে। স্মর্তব্য যে, ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন রোজ শুক্রবার অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণ দানকালেও মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের সামগ্রিক

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষণ-শাসনের মনোবৃত্তি ত্যাগ না করলে 'পূর্ব পাকিস্তান' আস্‌সালামু আলাইকুম বলিতে বাধ্য হইবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হইয়া যাইবে (পৃষ্ঠা-২২৭)"। ১৯৫৫ সালের পল্টনের জনসভায় এবং ১৯৫৭ সালে দলের কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর কণ্ঠেই প্রথম আজকের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হয়।

মওলানা ভাসানী যখন জাতিকে 'পূর্ব পাকিস্তান' তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান, তখন তার দলীয় সহকর্মী আওয়ামী লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আর শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হিসেবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা তখন নিজেদের গদির স্বার্থে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার 'পবিত্র দায়িত্ব' পালনে তৎপর। শুধু তাই নয়, মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কখনো কমিউনিস্ট, কখনো ভারতের চর হিসেবেও চিত্রিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু তার পরও তিনি তার অবস্থান থেকে এতোটুকু টলেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন মওলানা ভাসানীর অগ্রণী ভূমিকা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আছে ১৯৭০ সালের ৩০ নবেম্বর, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ও ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ প্রচারিত তিনটি প্রকাশ্য বক্তব্যে। সে বক্তব্য 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র'-এ খোদিত আমাদের ইতিহাসের অন্তর্গত বিষয় হয়ে আছে। আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমুদয় কৃতিত্ব দাবি যে কতো অসার ও হাস্যকর তা স্পষ্ট হয়ে সে সকল বক্তব্যে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ ৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর স্থান ইতিহাসই নির্ধারণ করে রেখেছে। মওলানার এ গৌরব নিয়ে কোনো গাথা রচে না কেউ। তাঁর পথ অনুসরণ করে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্নেহে ধন্য হয়ে মন্ত্রী-মিনিস্টার হয়েছেন অনেকে, এখনো আছেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীকে উজ্জ্বল করেননি কেউ, করার চেষ্টাও করেন না। তাদের ভয়, মওলানা সাহেবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেলে যদি অন্য কারো বিরাগভাজন হতে হয়! যদি গদি চলে যায়! মুখে নীতি-আদর্শের বুলি কপচিয়ে ক্ষমতার জন্য কী পেরেশান এই মানুষগুলো! মওলানা ভাসানী তো শুধু বড় নন, বিশাল। ক্ষমতার প্রতি নির্মোহ, দেশ ও জাতির প্রতি কমিটেড, শাসক-শোষকের জন্য আতঙ্ক এতো বড় মাপের নেতা এই ভূখণ্ডে আর একজনও জন্মগ্রহণ করেননি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছাড়া আর কেউ মওলানার এ বিশালত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করেননি। নিজে মহৎ ছিলেন বলেই আরেক মহত্তরের মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন তিনি।

এর আগে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুমের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে পল্টনের জনসভায়ও একই উচ্চারণের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাসবিদরা কি করবেন জানি না, তবে অনেকেই মওলানা সাহেবের সাতান্ন সালের আসসালামু আলাইকুমের কথাই বেশি বলেন। মওলানা ভাসানী আসলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বঞ্চনা ও নিগ্রহের অবসান এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলে আসছিলেন আরো আগে থেকেই। অন্য কোনো নেতা এ ব্যাপারে তেমন সাহসী ভূমিকা রাখেননি। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "..... আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করবো। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করবো অথচ জুট ট্যাক্স এমনকি রেলওয়ে ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, সেল ট্যাক্স নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তা হবে না। এইসব ট্যাক্সের ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টকে দেয়া হোক।" অর্থাৎ 'পূর্ব পাকিস্তানের' অধিকারের প্রশ্নে তখন থেকেই তিনি ছিলেন সোচ্চার। সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল এবং তার প্রতি পাকিস্তানী সামরিক জান্তার মনোভঙ্গি স্পষ্ট হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষের সামনে স্বাধীনতা যুদ্ধে

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী ফলাফলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকলেন। নির্বাচনে জিতলেও যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা 'পূর্ব পাকিস্তানীদের' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না মওলানা তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই বোধ থেকেই তিনি ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারের আওতায় পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া অর্থহীন বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই ১৯৭০ সালের ৩০ নবেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এ অঞ্চলের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৭৮-৮০ পৃষ্ঠায় মওলানা ভাসানীর 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শিরোনামে বক্তব্যটি খোদাই করা আছে। তিনি তাতে বলেন, "আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালিকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মতো দল-মত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩টি বছরের তো বটেই, এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হইতে আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষপর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। সেই পর্যায়ে আর কোন যুক্তি ও শক্তি দ্বারা ধামাচাপা কিংবা দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াস সহ্য করা হইবে না। মরণ-কামড়ে আর গগনবিদারী হুংকারে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সফল সংগ্রামী রূপায়ণে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বছর পূর্বে ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়াছিলাম, হয়তো বঙ্গবাসী সেইদিন নাটকের সব কয়টি অংক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাঙালিকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। এইবার নেমিসিসের অন্যায়ের সমুচিত শাস্তি বিধানের অপেক্ষায়ই আমরা আছি। যাহা হইবার তাহাই হইবে।

আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানীদের নতুন পথের সন্ধান দিবে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যাবতীয় সার্ভিস দান করিয়াছিল। সরকারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশনার ও দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সফরের

www.pathagar.com

আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু আজ ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারের সকল প্রকার প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র পাকিস্তান নহে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের সর প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ তহবিলে কোটি কোটি টাকা সাহায্য, কওমী গানের আসর, সাংবাদিকের ফিচার, সাহিত্যিকের রচনা সবই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা হইল, বরাবরই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলা অফিসারদের তরফ হইতে যে আচরণ পাইয়া আসিতেছিলাম আজ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এক কথায় সকল মহল হইতেই সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতা লাভ করিতেছি। ইহাতেও কি আমাদের চেতনার উদ্রেক হইবে না?

অতীতের ইতিহাস না আওড়াইয়া শুধু চলতি সালের ঘটনাবলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের লক্ষ্য শক্তির সংগ্রামে না পৌঁছাইয়া পারে না। পুনঃ পুনঃ বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এইবার একই বছরে আমরা দুইটি বন্যা ও দুইটি ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছি। প্রথমবারের বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চারশত কোটি টাকা মূল্যের ফসল ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু পানিতে ভাসিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দফা বন্যায় আমরা হারাইয়াছি অতিকষ্টে রোপণ করা ধান, কলাই, তরিতরকারী ইত্যাদি। গত ২৩ অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা নির্ণয়াতীতভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর সর্বশেষে দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস যে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি সংঘটিত করিয়াছে এবং বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যার পর পুনঃ পুনঃ কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ, ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ আর উদাসীন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকবর্গকে তাহা নাড়া না দিলেও বিশ্বের তিনশত কোটি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

সরকার বরাবরের মত এই ধ্বংসলীলা ধামাচাপা দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় হইয়াছে! আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না যে, আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসা আর প্রজ্ঞাপ্রসূত বিবেচনার সম্মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছুই নহে; কিন্তু এই দুইটিরই অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি! সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিকট হইতে সেই ভালবাসা ও বিবেচনা পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই বলিয়াই যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগটি শতগুণ আঘাত হানিয়াছে। ইহার নতিজা সরকারকে ভোগ করিতেই হইবে। একজন মন্ত্রী মারা গেলে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য সরকারি প্রচারযন্ত্র কিভাবে মাতম শুরু করে তাহা আমাদের ভালভাবেই

www.pathagar.com

জানা আছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারনিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাত কোটি বাঙালিকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। লন্ডন, পিকিং, ওয়াশিংটন, তেহরান, আম্মান, সিডনি, টোকিও ও কলকাতার বেতার যখন বিশ্ববাসীর নিকট সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, সাহায্য সামগ্রী পাঠানোর আবেদন জানাইতেছে, তখনও পাকিস্তানের বেতার, টিভি বিশ্বাসঘাতক ও চরম মিথ্যাবাদীর ভূমিকা পালন করিতেছে; তখনও তাহাদের আহ্লাদমাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই, বার লক্ষাধিক রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন-কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। অনেক কোরবানী দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সব কিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ-বিবৃতির নয়-প্রত্যক্ষ মোকাবেলার। এই মোকাবেলা আপস-নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়-পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত-নির্যাতিত বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে মিছিল ও জনসভার আয়োজন করুন। তাই মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট জরুরি আবেদন করিতেছি।

এই দিন আপনারা আওয়াজ তুলুন ঃ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবানী দিতে সদাপ্রস্তুত। সেই সাথে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন আমরা স্বাবলম্বী, আত্ম-নির্ভরশীল এবং শৃংখলমুক্ত হইতে চাই। আমরা বিশ্বাসঘাতক আমলাদের শায়েস্তা করিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। সকল প্রকার বাধাবিপত্তি ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিব আশা করি। বিশ্ববাসীরও ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি হুঁশিয়ারিও উচ্চারিত করিতে চাই- আমাদের দুর্যোগ ও দুর্দিনকে সম্বল করিয়া যাহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন চাল চালাইতে চায় তাহাদিগকে আমরা বরদাস্ত করিব না। আমাদের প্রয়োজনে যাহারা সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিতেছেন তাহাদিগকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই; কিন্তু সেবার নামে কেহ যদি ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আমাদিগকে আটকাইতে চায় তবে তাহাকেও তল্পীতল্পাসহ আমরা তাড়াইতে বাধ্য হইব।

www.pathagar.com

বাঙালি কোন দিন শিকলের বন্ধনকে মানিয়া লয় নাই আর লইবেও না। বিদেশী সৈন্যই হউন, কূটনীতিকই হউন, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া কাজ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।"

পাকিস্তানী সংবিধানের ভিত্তিতে ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয় সত্তর সালের ৭ ডিসেম্বর। এই নির্বাচন যে অর্থহীন হবে, 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের প্রাণের দাবি যে এর মাধ্যমে পূরণ হবে না, মওলানা ভাসানীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিলো অনেক আগেই। এই অঞ্চলের জনগণের করণীয় তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন নির্বাচনের আগেই। তখন স্লোগান উঠেছিল, 'ভোটের বাক্সে লাথি মার-পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর।' ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং বাম প্রগতিশীল যে শক্তি তখন এ স্লোগান তুলেছিলো, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-পাগল এবং ভোট-পাগল আওয়ামী লীগ তাদের চিহ্নিত করেছিল রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে। চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান স্লোগান তোলেন- 'নির্বাচন বর্জন করে যারা-দেশ ও জাতির শত্রু তারা।' এ থেকে বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এ দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভাসানী-মুজিব কার অবস্থান কোথায় ছিল।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ ৪

পাকিস্তানভিত্তিক সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনের আগে মওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বাধিকার আদায়ের প্রশ্নে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পরেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ নেতা সে বক্তব্যে অটল ছিলেন। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের চাপের মুখে ৩ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। শেখ মুজিব এবং তার সমর্থকরা তখন আনন্দে বিভোর। মুজিবের চোখের তারায় মায়াবী স্বপ্ন। ইতোপূর্বেই তাকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন করা হয়, অধিবেশন বসলেই তিনি হবেন সংসদেরও নেতা। সুতরাং তার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ একেবারেই পরিষ্কার!

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সহকর্মীরা ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চাল বুঝতে অক্ষম ছিলেন। তারা তখন ক্ষমতার নেশায় বুঁদ। কিন্তু মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেখ মুজিবের আশা পূরণ হবে না, তিনি দিবাস্বপ্ন দেখছেন। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এককেন্দ্রিক, বিজাতীয় শাসক-শোষকগোষ্ঠী নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতির জন্য সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে তারা মুজিবের নাকের ডগায় ক্ষমতার মুলো ঝুলিয়ে রেখেছে মাত্র। তাছাড়া তিনি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বাধীনতা হাসিল করা ছাড়া এ জাতির মুক্তি নেই।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি বারবার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'মুজিব, তুমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করো না, তুমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হও'। শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর কথায় কর্ণপাত করেননি। পাকিস্তানীদের সমর প্রস্তুতির মুখেই একাত্তর সালের ১ জানুয়ারি সাহসী মওলানা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করেন। তাতে তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ১ দফা দাবি উত্থাপন করে বলেন-

"১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

www.pathagar.com

সেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের ১০ কোটি মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় কিনা তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ সর্বসম্মত রায় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু জনগণের উক্ত রায় অনুযায়ী দুইটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসন ও পশ্চিমা শোষক-শাসকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষিত-নির্যাতিত হইতে চায় কিনা, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাহারই সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করিয়াছিল।

ঠিক একইভাবে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আর একবার এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী শাসক, আমলাতন্ত্রের শাসন, শোষণ ও চক্রান্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো কোরবানি দিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ প্রস্তুত রহিয়াছে।

বিগত ২৩ বছরের শোষণ-শাসনের মর্মান্তিক ইতিহাস ও তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বারে বারে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, ব্রিটিশ ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের শোষণ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সংখ্যাগুরু পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শাসক ও শোষকচক্রের শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইয়াছে।

এবারকার ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন কোন ব্যক্তি ও দলের জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নহে, ৬ দফা ৯ দফার প্রশ্ন নহে, এই দেশের বাঙালি জনগণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চায় কিনা ভোটের মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

আপস-আলোচনার মাধ্যমে কেবলমাত্র গদি দখল করিয়া মন্ত্রী বানাইবার জন্য নয় বরং পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি বাঙালি জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার একক দাবিই এবারকার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

আর ইহাও দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হইলেই জনগণের সমস্যার সমাধান হইবে না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জন কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা মেহনতি মানুষের মৌলিক সমস্যা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা 'সমাজতন্ত্র' কায়েমের উপর। অন্যথায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের মতই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

এখন জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষের কর্তব্য হইল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগদান করিয়া মাতৃভূমিকে পশ্চিমা শোষকদের কবল হইতে মুক্ত করা।

এই উপলক্ষে আগামী ৯ই জানুয়ারি, ১৯৭১, ২৩শে পৌষ, ১৩৭৭ বাং রোজ শনিবার সন্তোষে (টাংগাইল) স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে সংগ্রামী কর্মীগণ দলে দলে যোগদান করিবেন।

এই মহতী সম্মেলনে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হইবে। পরদিন ১০ই জানুয়ারি রবিবার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভায় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি ঘোষণা করা হইবে।

দেশপ্রেমিক সংগ্রামী কর্মীদের নিকট আমার অনুরোধ- গ্রামে-গ্রামে শহরে-বন্দরে, হাট-বাজারে সভা, পথসভা, মিছিল, বৈঠক, পোস্টার, ফেস্টুন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইয়া এই সর্বদলীয় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন" (সৈয়দ আবুল মকসুদের লেখা গ্রন্থ- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃষ্ঠা-৭৯৯–৮০০)।

৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর উৎফুল্ল মুজিব আশা করেছিলেন যে, তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের শাসনকর্তা হচ্ছেন। তখন ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার অনুগত কাইউম মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীই শুধু নয়, আওয়ামী লীগও ভাসানীর ১ জানুয়ারির বক্তব্যের কঠোর সমালোচক হয়ে ওঠে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সত্তরের নির্বাচনে কাইউম মুসলিম লীগ পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৩২ জন প্রার্থী দিয়ে জিতেছিলো মাত্র ৯ জন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ১১৯ আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিলো ৭টি আসনে, আর ২০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে জামায়াতে ইসলামী পেয়েছিলো মাত্র ৪টি আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন ছিল ১৩৮। এর মধ্যে ১২২টিতে প্রার্থী দিয়ে ভুট্টোর পিপলস পার্টি জিতেছিলো ৮৮টিতে। যে সামরিক জান্তা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো তার সদস্যরা ছিলেন জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লেঃ জেনারেল এস. এম. জি. পীরজাদা, লেঃ জেনারেল গুল হাসান, লেঃ জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল গোলাম ওমর, মেজর জেনারেল আকবর খান। বেসরকারি ব্যক্তি ছিলেন দু'জন- এম এম আহমদ এবং এন এ রিজভী। জেনারেল হামিদ ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, লেঃ জেঃ পীরজাদা ছিলেন প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার, গুল হাসান ছিলেন চিফ অফ স্টাফ, টিক্কা খান ছিলেন কোর কমান্ডার, ওমর ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির চেয়ারম্যান, আকবর খান ছিলেন আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক। এম

www.pathagar.com

এম আহমদ ছিলেন প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আর রিজভী ছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক। ইয়াহিয়া খান ছিলেন মূলত এই জান্তার হাতের পুতুল। এই জান্তাই ভুট্টোর মধ্যে অতিউচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

নির্বাচনের পর থেকেই জান্তার সামরিক লোকদের 'পূর্ব পাকিস্তানের' ওপর নজরদারি বেড়ে যায়। মওলানা ভাসানী বুঝে যান, নাটাই ওদের হাতে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হতবাক করে দেয় এই জান্তাকে। তারা দুটি বিকল্প রণনীতি নিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথমত, মুজিব-ভুট্টোর সমন্বয়ে কেন্দ্রে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকার গঠন করে দেয়া- যাতে ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থেকে যায়। সেই রকম একটি সরকারে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সাময়িক প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেও তাতে 'পূর্ব পাকিস্তানের' জনগণের কোনো কল্যাণ হবে বলে বিবেচনা করেননি মওলানা ভাসানী। জান্তার দ্বিতীয় বিকল্প ছিল- "পূর্ব পাকিস্তানীরা' বাড়াবাড়ি করতে চাইলে অস্ত্রের ভাষায় তা গুঁড়িয়ে দেয়া- প্রয়োজনে 'পূর্ব পাকিস্তানীরা' কোনো প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই। মওলানা ভাসানী তা আগেই আন্দাজ করেছিলেন এবং পাকিস্তানীরা যে দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেছে নেবে তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিলো না।

শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার ফাঁদে পা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিলেন। তিনি এমন ধারণা দিলেন যে, আপোসেই সব ঠিক হয়ে যাবে এবং তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন। অপরদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সামরিক জান্তা ছিল তার পেছনে। জান্তার সঙ্গে এক সময় ভুট্টোর সম্পর্ক ভালো ছিল না তার মধ্যে একটা স্বাধীনচেতা ভাব ছিল বলে। পরে জান্তার শক্তিমান সদস্য জেনারেল পরীজাদার মাধ্যমে জান্তার সঙ্গে ভুট্টোর সখ্য গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি আবদুল হামিদ খান চার তারকা পেয়ে পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হন। তখন থেকেই তিনি পাকিস্তানের তৃতীয় সামরিক প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। ইয়াহিয়া খান তা চাইছিলেন না। নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্যই তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা এবং একটা আপোসরফার উদ্যোগ নেন। তিনি শেখ মুজিবকে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। মুজিব আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে ইয়াহিয়াকেই ঢাকা আসার অনুরোধ জানান। জেনারেল ইয়াহিয়া মুজিবকে সম্মান দেখালেন এবং ১২ জানুয়ারি '৭১-এ সত্যি সত্যি ঢাকা চলে এলেন। এসে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ওইদিনই। দু'জনের বৈঠক চলে প্রায় পৌঁনে দু'ঘণ্টা। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব বললেন,

www.pathagar.com

"আমাদের আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে"। 'দৈনিক পাকিস্তানে' শেখ সাহেবের এ বক্তব্য ছাপা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৩ জানুয়ারি। পরদিন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা খোন্দকার মুশতাক আহমাদ, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও কামরুজ্জামানকে নিয়ে শেখ মুজিব আবার ইয়াহিয়ার সঙ্গে তিন ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে তার বাসভবনে সাংবাদিকদের আবারো জানান, "আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট খুব শিগগির ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।" (দৈনিক পাকিস্তান : ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৪ জানুয়ারিই ঢাকা ত্যাগ করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের অন্যান্য নেতার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে, এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট। দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তার সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে যে সকল কথা বলেছেন তা পুরোপুরি সঠিক।" (দৈনিক পাকিস্তান ঃ ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১)। বৈঠক সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের বক্তব্যে ছিল এক সুর- একে অপরের পরিপূরক। মওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তান' এবং এর অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝলেন মুজিবকে ক্ষমতার টোপ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে' ঘুমিয়ে রাখা হচ্ছে। অথচ জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে তাদের দরকার জেগে ওঠা, দরকার সঠিক পথ নির্দেশ। ওই পরিস্থিতিতে মার্চ মাসে আপোস আলোচনার নামে নতুন খেলা শুরুর আগে ৯ মার্চ তিনি জনগণের প্রতি 'পূর্ব পাকিস্তানের' আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। তাতে তিনি বলেন, "আজ আমি সাত কোটি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরি আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে, ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শোষকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম করা।

১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা হস্তান্তরের ইতিবৃত্ত ও নির্গলিতার্থ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে নবরূপে শোষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে শতকরা ৯৮ জন দেশবাসী অবহিত আছেন এবং সেই জন্যই আজ আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীন-সুখী দেশ প্রতিষ্ঠা করার নামে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী শোষকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বাধীনতার যে প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছিল, আসুন আজ আমরা একত্রিত হয়ে এই কপট স্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করি।

www.pathagar.com

আসুন, আজ আমরা ব্রজকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের হাতে গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাব।

আসুন আমরা ঘোষণা করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এর চেয়ে কম কিছু নয়। কারণ অন্য কোনও উপায়ে শোষিত কোটি কোটি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসতে পারে না।

আসুন, আমরা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, 'জয় বাংলা' রব তুলে নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালির ভোট তথা সমর্থন নিয়ে সেই শক্তির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও সামরিক শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে যেনতেন প্রকারের একটা আপোস এবং সমঝোতার সরকার গঠনপূর্বক শোষিত বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিধাহীন ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্বার বানচাল করার যে চক্রান্ত মুষ্টিমেয় ভাঙালি শোষক ও তাদের হোতারা করে চলেছে, সেই হীন ষড়যন্ত্রকে আমরা শতকরা ৯৫ জন শোষিত, নিপীড়ত বাঙালি একযোগে অঙ্কুরেই প্রতিহত ও বিনষ্ট করব।

আসুন, আমরা শেষ ও চূড়ান্তবারের মত পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে একত্রিত হই এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী ও মুষ্টিমেয় বাঙালি শোষকের শত বাধাবিপত্তি ও আক্রমণকে প্রতিহত করে জয়যাত্রা শুরু করি।

"ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরি হও জোট বাঁধো- মাঠে কিষাণ, কলে মজুর, নওজোয়ান জোট বাঁধো।

এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল, হও শামিল, হও শামিল, হও শামিল।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৭১২-৭১৩)।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ–৫

বাসুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিলো তাঁর। আমাদের পৃথক মানচিত্রের চিন্তা তার আগে আর কেউ করেননি। এখন অনেকে অনেক কথা বলেন, কোন একজনকে 'মানবদেবতা' বানাতে চান। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করার মতো কোন প্রামাণ্য দলিল আজ পর্যন্ত কেউ হাজির করতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা একদিকে ছিলো প্রেরণাদায়ক, অপরদিকে ছিলো দিক নির্দেশনামূলক। জন্মভূমির মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তাঁকে অসীম সাহসী করেছিলো। পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধ্বে ছিলেন বলেই তাঁর ভেতর কোন আপোষকামিতা ছিলোনা। স্পষ্ট কথা বলতেন, সত্য কথা বলতেন। তাতে কে রাগ করলো, কে খুশী হলো তার পরোয়া করতেন না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা তিনি বলতে শুরু করেন সেই পঞ্চান্ন সাল থেকে। প্রচ্ছন্নে ও কৌশলে উত্থাপন করা হলেও তাঁর সে বক্তব্য সচেতন মহলের কাছে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিলো না। তিনি জানতেন, দেশ ও জনগণের স্বার্থে কোন কথা কখন কিভাবে বলতে হবে। ১৯৬৯ সালে অগ্নিগর্ভ 'পূর্ব পাকিস্তানে' নানাজন যখন নানা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাষে ব্যস্ত, মওলানা ভাসানী তখন অবিচল, স্থির। ১৬ ফ্রেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে এক চরমপত্র দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকে তা ছাপা হয়। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ' দলিলপত্র, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০-এ সে চরমপত্র সন্নিবেশিত হয়। চরমপত্রে মওলানা ভাসানী বলেন, "আগামী ২ মাসের মধ্যে সরকার ছাত্র সমাজের তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রাণের দাবি ১১ দফা মানিয়া না লইলে জনসাধারণ খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ করিবে। তিনি ঘোষণা কনের যে, নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলনের দিন শেষ হইয়াছে। এখন অনিয়মতান্ত্রিক ও সহিংস আন্দোলন শুরু হইবে। মওলানা ভাসানী প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে 'ডাক' (ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি) নেতাদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল ব্রিটিশ আমলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের চাইতেও খারাপ হইবে। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশের গোলটেবিল বৈঠকের মারফত যেমন পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই, ঠিক তেমনি বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকেও জনসাধারণের দাবি আদায় সম্ভব নয়"।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া খানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের আওতায় পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। মওলানা ভাসানী বারবার বলেছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তানী' জনগণের সমস্যার কোন সমাধান হবে না, এ অঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। এই ভূ-খণ্ডের মানুষের প্রতি পাকিস্তানী শাসক-শোষক চক্রের সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনা এবং জুলুমের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, কারো ক্ষমতা লিপ্সার কাছে যাতে আত্মসমর্পণ না করে সে জন্য জাতির উদ্দেশে তিনি দিক-নির্দেশনামূলক এক বক্তব্য রাখেন ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর। ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্পষ্টভাবে তিনি স্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' আওয়াজ তোলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, অখণ্ড পাকিস্তানভিত্তিক সকল দুর্বলতা, ভীরুতা কাটিয়ে জনগণ যাতে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তানের' মানুষকে তার দিক-নির্দেশনা এক বিস্ময়কর ঐক্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তার প্রতিফলন ঘটে মাত্র ২ দিন পর ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে। সামরিক জান্তার সহযোগী অখণ্ড পাকিস্তানপন্থী দুই মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামীর ভরাডুবি ঘটিয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ জানিয়ে দেন যে, তারা আর পাকিস্তানের সঙ্গে নেই। মওলানা সাহেবের সে ঐতিহাসিক বক্তৃতা "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শিরোনামে ৫ ডিসেম্বর '৭০-এ ছাপা হয় যশোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি'তে। স্বাধীনতার দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৮৪ পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ আছে। মওলানা ভাসানী তাতে বলেন, সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

"ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে গৃহতি প্রতিবাদ দিবসের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে আয়োজিত এই জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি জনগণকে সব ভীরুতা-জড়তা ত্যাগ করে উক্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। মাওলানা ভাসানী বলেন, সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবি আইনসঙ্গত-এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়, স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেকিরার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লাখ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরো ১৫/২০ লাখ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো।' মওলানা বলেন, 'জয় বাংলা' শ্লোগান বন্ধ করার জন্য কোনো সৈন্য দেয়া হয়নি। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

করুন। যদি কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে হাত তুলুন।' জনতা মুহুর্মুহু স্লোগানের সঙ্গে হাত তোলেন। মওলানা ভাসানী তখন নিজেই শ্লোগান দেন, 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহু আকবর,' 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ কণ্ঠ থেকে তাদের প্রিয় নেতার স্লোগানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে।"

সত্তর সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন শেষে ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ আবার পল্টন ময়দানে জনসভায় আয়োজন করেন মওলানা। ন্যাশনাল এসেম্বলীর বৈঠক ডাকা হয়েছিলো ৩ মার্চ। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সে বৈঠক স্থগিত ঘোষনা করেন ইয়াহিয়া খান। আলোচনার টোপ ফেলা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে। তিনি আলোচনায় রাজি হয়ে যান। মওলানা পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতর কোন ফায়সালায় রাজি ছিলেন না। শেখ মুজিব যাতে পাকিস্তানীদের টোপ গিলে ফেলতে না পারেন, সে জন্য তিনি পল্টনের জনসভার তার ঐতিহাসিক ১৪-দফা ঘোষণা করেন। ১০ মার্চ 'দৈনিক পাকিস্তানে' "মওলানা ভাসানীয় ১৪-দফা কর্মসূচী" শিরোনামে তা ছাপা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৩ পৃষ্ঠায় তা সন্নিবেশিত আছে। নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হলো ঃ

"পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ন্যাপের জনসভায় সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজনমত এই কর্মসূচির সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবধন করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

বিগত ৯ জানুয়ারি সন্তোষ সম্মেলনে এবং ১০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষিত মুক্ত পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন; উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বণ্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের বিকল্প সকল বিদেশী পণ্য বর্জন;

পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন;

শেখ মুজিবুর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহবান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট-বাজারের তোলা, খাজনা ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা;

নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সামরিক সৈন্য, কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারীদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি বন্ধ রাখা;

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যাতে কোনো দ্রব্য সামগ্রী সীমান্তের অপর পারে চোরাচালান না হতে পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

ত্রিশ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের নিমিত্তে স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা;

পূর্ববাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংকসমূহে কোনো টাকা জমা না রাখা;

দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্যে কালোবাজারী ও আড়তদাররা যাতে নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্য মজুত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া;

বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ধাবিয়ে গণসংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা;

বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলনের নামে টাউট ও প্রবঞ্চকরা যাতে চাঁদা তুলতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

বিদেশী সৈন্য যাতে বাংলার মাটিতে অবতরণ করতে না পারে তজ্জন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সামুদ্রিক বন্দরগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা;

গণবিরোধী শাসক চক্রের তমঘা, খেতাবসহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জন করা।

এছাড়া সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে নিরীহ নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী বাঙালির উপর গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং নিহত ও আহত স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি গভীর সংগ্রামী সমবেদনা জানানো হয়। প্রস্তাবে দেশের সর্বত্র গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহবান জানানো হয়।"

একাত্তর সালের ১৭ মার্চ মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে এক সমাবেশ করেন। তখন চলছিলো ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা-নাটকের মঞ্চায়ন। স্বাধীনতার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্নস্থানে তখন বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। শেখ মুজিব বারবার সাংবাদিকদের মাধ্যমে জাতিকে জানাচ্ছেন, আলোচনা চলছে, ফলপ্রসূ আলোচনা। জনগণের মধ্যে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। তারা চান 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বাধীনতা আর মুজিব চান অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব। ঠিক সেই মুহূর্তে মওলানা ভাসানী ইয়াহিয়া-মুজিবের মধ্যে কোন প্রকার আপোষের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে মানুষের মনোবল অটুট রাখার কুশলী উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্বাধীনতা সম্পর্কে তার (মওলানার) এবং শেখ মুজিবের মধ্যে পরিষ্কার কোনো বোঝাপড়া রয়েছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে বলা যায় না। অনেক কিছুই রাজনীতিকদের নিজেদের কাছে গোপন থাকে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

মওলানা বলেন, ইয়াহিয়া এখন যা করতে পারেন তা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধয়ক সরকার গঠন করা। তার কাজ হবে দু অংশের মধ্যে সম্পদ ও দায়ের হিসেব করা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা দু অংশের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান বলেন যে, দেশের দুই অংশের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত জনাব ভুট্টোর সুপারিশ তাকে (ভুট্টো) আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

আজ সকালে এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, তার জীবনের ৮৯ বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবিতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মত একতা এবং সহযোগিতা কোনোদিন দেখেন নি।

মওলানা ভাসানী বলেন, প্রথমে প্রধান ইস্যু সম্পর্কে মীমাংসা করতে হবে। পরে যদি দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি তখন তিনি আবার সংগ্রাম শুরু করবেন।

ন্যাপ প্রধান বলেন, 'আমি সাম্যবাদ, লেনিনবাদ এবং মাওবাদ সম্পর্কে কিছু বুঝি না। মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' বইও আমি পড়িনি তবে আমি একথা ভাল করে বুঝি যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে রয়েছে।

মওলানা ভাসানী বলেন, দেশ ভাগ হওয়ার পরেও যারা এখানে এসেছেন তাদের এখানে থাকার অধিকার রয়েছে, কারণ এদেশের জন্য তারা সংগ্রাম এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

রিলিফের টাকা ঠিকমত এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয় কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্যে তিনি শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা ভুটোকে দিন

পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে, ন্যাপ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জেড এ ভুট্টোর হাতে অর্পণের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।" মাওলানা ভাসানীর এ বক্তব্য পরদিন ১৮-০৩-'৭১-এ 'দৈনিক পূর্বদেশে' ছাপা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫৬ পৃষ্ঠায় তা খোদিত আছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ–৬

১৯৭১ সালের ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সভাপতি মওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের' স্বাধীনতার দাবিতে তার ঐতিহাসিক ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর আগে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিনের বিশাল জনসভার আয়োজন, মওলানা সাহেবের তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ এবং ১৪ দফা কর্মসূচি তৎকালীন রাজনৈতিক উন্মাতাল পরিস্থিতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানে' শেখ মুজিবের বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা আওয়ামী লীগের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘোষণার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এটুকু বলা চলে যে, এর উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা এবং সামরিক জান্তাকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া যে, স্বাধীনতার প্রশ্নে এই ভূখণ্ডের জনসমর্থিত সকল নেতা ও রাজনৈতিক শক্তি একতাবদ্ধ, এ ব্যাপারে কোনো প্রকার টালবাহানায় কাজ হবে না। আপোসের কোনো চোরাগলিতে পা না দেয়ার জন্য শেখ মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে ও উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ৬ মার্চ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে 'পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর নিয়োগ করেন এবং নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ৭ মার্চই টিক্কা খান ঢাকায় চলে আসনে। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জনাব বি এ সিদ্দিকী ৯ মার্চ টিক্কা খানকে গবর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান। ইয়াহিয়া খান তখন সংশ্লিষ্ট সামরিক বিধি পরিবর্তন করে লে ঃ জেঃ টিক্কা খানকে 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন। টিক্কা খানের অতীত নৃশংস কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিল। তাকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগের অর্থটা তাই তারা বুঝে গিয়েছিলেন। একদিকে জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টিক্কা খানের নিয়োগ এবং অপরদিকে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনার প্রস্তুতি এবং তাতে শেখ সাহেবের স্বীকৃতি জনগণকে একদিকে বিভ্রান্ত করেছিল, অপরদিকে করছিল হতাশ। প্রয়োজন ছিল জনগণের মনোবল অটুট রাখা এবং সকল প্রকার বিভ্রান্তির অবসান ঘটানো। স্বাধীনতার প্রশ্নে অটল মওলানা ভাসানী সে কাজটাই করেছিলেন একাত্তরের ৯ মার্চ। তিনি পল্টনের

www.pathagar.com

জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার আপসও সম্ভব নয়। ইয়াহিয়া খানের প্রতি তিনি এই দাবির মর্যাদা রক্ষা করে অবিলম্বে ৭ কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, ২৫ মার্চের মধ্যে (একাত্তর সালের) এই দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। শেখ মুজিবের আপোসকামী ভূমিকায় জনগণ যাতে হতাশ ও হীনবল না হয়ে পড়ে, তিনিও জনগণের পক্ষে থাকবেন-এই ধারণা দিয়ে জনগণের মনোবল অটুট রাখার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী সেই কুশলী ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল। মুজিব আপস ফয়সালার চোরাগলিতে পা রাখলেও জনগণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ছিল দৃঢ়।

মওলানা ভাসানীর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ একাত্তরের ১০ মার্চ ছাপা হয় তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১৯-৩২১ পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ করা আছে। সেই জনসভায় আতাউর রহমান খান এবং ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়াও ভাষণ দিয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য সন্নিবেশিত আছে একই গ্রন্থের ৩২১ ও ৩২২ পৃষ্ঠায়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা হুবহু তুলে ধরা হলো ঃ "ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার পল্টনের এক জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেন যে, সাত কোটি বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার আপোষও সম্ভব নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই দাবির মর্যাদা রক্ষা করে অবিলম্বে ৭ কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা দানের আহবান জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে এই দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন।

বর্তমান সংগ্রামের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলে শেখ মুজিবুর রহমান তার সঙ্গে আপোষ করবে। তিনি বলেন, এই সন্দেহ অমূলক। শেখ মুজিব বা মওলানা ভাসানী বা যে কোন নেতা যদি এ ব্যাপারে আপোস করতে যায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না। আপোসের সময় চলে গেছে। এখন আপোসের আর কোনো পথ খোলা নেই। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আস্থা রাখার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন,

www.pathagar.com

তাকে আপনারা অবিশ্বাস করবেন না। শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার সংগ্রামী বীর হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, ১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সেদিন আমার কথা অনুধাবন করতে পারেননি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, দুই অংশ যদি একত্রে থাকে তাহলে কালব্যাধি যক্ষ্মার জীবাণু যেমন দেহের হৃৎপিণ্ডের দু অংশকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনি পাকিস্তানের দু-অংশই বিনষ্ট হবে। তাই বলেছিলাম যে, তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর এবং আমরা আমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন। তিনি বলেন, আমি ৭ কোটি বাঙালিকে আজ মোবারকবাদ জানাই এ জন্য যে তারা এই বৃদ্ধের ১৩ বছর আগের কথা এতদিন পরে অনুধাবন করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিঃসহায় মানুষের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণের নিন্দা করে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অত্যাচারী শাসক ও জালিম কখনও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তার পতন অনিবার্য। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মুসলিম লীগ সরকার ও আইয়ুব খানের পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

তিনি বলেন, ব্রিটিশ জাতি বুদ্ধিমান ছিল। তাই তারা এদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়ার মতো পর্যায়ে পৌছার আগেই স্বাধীনতা দিয়ে যায়। তেমনিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাংলার ৭ কোটি মানুষকেও তিনি অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানের দাবি জানান।

তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে জনাব দওতানা, জনাব ভুট্টো ও জনাব খুরোসহ বিভিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অহিংস আন্দোলন প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, আমি কোনোদিন অহিংসায় বিশ্বাস করি না। রাসূল (সঃ) অহিংসায় বিশ্বাস করতে বলেননি। জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। জালিমের অত্যাচার যে সহ্য করে এবং যে অত্যাচার করে তারা উভয়েই মহাপাপী। তিনি বলেন, অহিংস পন্থা অবাস্তব। দেশে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে দায়ী করেন। পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের যুক্তি একজন নিরক্ষর নাগরিকের নিকটও গ্রহণযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টের ভূমিকার নিন্দা করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি কোনো মর্যাদা না দিয়ে তার আইনগত কাঠামোর কথা জোর গলায় প্রচার করছেন। তিনি আইনগত কাঠামো আদেশের বলে সবকিছু করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে এরূপ আদেশের কোনো নজীর কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এলএফও'র কঠোর নিন্দা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের গণতন্ত্র শুধুই মুখের কথা। কোন দেশে পার্লামেন্টকে কেউ বাধা দেয় না। এটা গণতন্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত।

জনাব ভুট্টোর পরিষদ বর্জনের হুমকি প্রসঙ্গে ন্যাপ প্রধান বলেন, এটাও নজীরবিহীন ঘটনা। আজাদীপূর্বকালে ভারতীয় পার্লামেন্টে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পার্লামেন্টে যোগ দেব না এরূপ কথা বলেনি। আইন পাসের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ট দল পরিষদে বাধা দান করেছে, যুক্তিতর্ক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেছে। ভুট্টোর উচিত ছিল সেই গণতন্ত্রসম্মত পথ অনুসরণ করা। পশ্চিম পাকিস্তানী গরীব জনগণের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি কোনো আইন পাস করত বা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার চেষ্টা করত এবং একথা যদি ভুট্টোর দল প্রমাণ করতে পারত তাহলে জনমত তার দলের পক্ষে যেত।

তিনি ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন, সেখানে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার প্রতিশোধ ইন্দোনেশিয়ার জনগণ নেবেই। নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে গুলি করে হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের মা বোনদের আজ গুলি করে মারা হচ্ছে। গত পরশু আমি চরে গিয়েছিলাম। এক মহিলা কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তার ছেলে রাজশাহীতে পড়ত, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই মহিলা চীৎকার করে কাঁদছে। বাংলা মা'র কোল এমনি করেই খালি করে বাংলাকে ক্রন্দসী বাংলা করছে।

তিনি বলেন, সন্তানের জন্য মায়ের যে বেদনা তা ইয়াহিয়া বুঝবে না। সন্তানহারা মায়ের অভিশাপ বিফলে যাবে না।

বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহবান জানান। তিনি বলেন, সিমেন্টের দাম ইতোমধ্যেই প্রতি বস্তা এগার টাকা হতে পনর টাকায় ও ঢেউটিন প্রতি বান একাশি টাকা হতে ২শ' ৪২ টাকায় উঠেছে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এখন হতে প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ব্যাপারে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চরিত্র গঠন করতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ হতে একটি কানাকড়িও যেন বাইরে পাচার না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আহবান জানান।

মওলানা ভাসানী বাঙালি, অবাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে সকলকে মিলেমিশে থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, বিহারীদের আমি বড় ভালোবাসি। ওরা অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেছে। ওরা পশ্চিম পাকিস্তানী নয়-হিন্দুস্তানের অধিবাসী ছিল। তাদের ওপর বহু নির্যাতন হয়েছে। তিনি বলেন, এদের সবার সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। কারণ এগুলো আমাদের দেশের সম্পদ।

আতাউর রহমান

পল্টন ময়দানের জনসভায় বক্তৃতাকালে জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান কালবিলম্ব না করে বাংলায় জাতীয় সরকার ঘোষণা করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহবান জানান।

জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, আজ আর আমাদের মধ্যে কোনো কোন্দল নেই। বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাঙালি জজ, সিএসপি ও সরকারি কর্মচারীরাও আজ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। তারা রক্ত দিচ্ছেন এবং প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবেন। তাই এই মুহূর্তে শেখ মুজিব জাতীয় সরকার গঠন করলে সবাই তার হুকুম মেনে নেবে। আজকের এই মুহূর্ত আর বারবার ফিরে আসবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতীয় লীগ নেতা বলেন, বাংলার আজ মহাদুর্দিন। বাঙালি জাতির সামনে আজ চরম পরীক্ষা। বাঙ্গালি এখন জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীনতার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি।

বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শোষকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, তারা বাঙালিদের শাসন ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব করতে দিতে চায় না। শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীকেও তারা বিশ্বাস করেনি। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে তারা ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না। তাই একবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে আবার তা বন্ধ করে দেয় এবং পরে আবার তারিখ ঘোষণা করে।

শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, ভানুমতির খেলা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা

www.pathagar.com

করুন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, বাঙালি জাতি আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের ৭ কোটি মুক্তিপাগল মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

ইতোপূর্বে জনসভার প্রস্তাব পাঠকালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ন্যাপ সম্পাদক জনাব মশিয়ূর রহমান বলেন, আজ রাজনৈতিক কোন্দলের দিন নয়। ন্যাপ কোন্দলে বিশ্বাস করে না। তাই আজ আমরা ঐক্যবদ্ধ।"

৯ মার্চ '৭১ পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার দাবিকে বিপথগামী করার জন্য সুচতুরভাবে চলছিল অন্তরালের খেলা। অপরদিকে চলছিল, স্বাধীনতার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য ভয়ংকর সামরিক প্রস্তুতি। শেখ মুজিবুর রহমান বুঝে হোক কিংবা না বুঝে হোক ইয়াহিয়ার টোপ গিলে ফেলেছিলেন। তিনি মওলানা ভাসানীর আহবানে সাড়া না দিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আপোস আলোচনায় বসে গেলেন। এর পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। ২৫ মার্চ '৭১ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত, অসংগঠিত, নিরীহ, নিরস্ত্র 'পূর্ব পাকিস্তানবাসীর' ওপর। সে রাতেই বেঘোরে প্রাণ হারায় অগণিত মানুষ। ৯ মার্চ '৭১ মওলানা ভাসানী যদি পল্টনে জনসভা করে দিক নির্দেশনামূলক কিছু মূল্যবান কথা জাতিকে না শোনাতেন, তা হলে ২৫ মার্চ রাতে লাশের মিছিল যে আরো অনেক অনেক দীর্ঘ হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ মওলানা সাহেবের বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝেছিলেন, অথচ শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তব্য অনুধাবণ করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে তিনি ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আপোস আলোচনার পিঁড়িতে বসতেন না। সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের বাঙালি অফিসার-জওয়ানরা হাতিয়ার হাতে প্রস্তুত ছিল- যখন অবাঙালি পাকিস্তানী সৈন্যরা ছিল সংখ্যায় কম ও দুর্বল। জনগণও ছিল মানসিকভাবে প্রস্তুত। শেখ মুজিব যদি মওলানা ভাসানীর পরামর্শ ও সতর্কতাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে পূর্বাহ্নেই স্বাধীনতার ডাক দিতেন, তাহলে নয় মাসের যুদ্ধ, এতো রক্তক্ষয় এবং ভারতের সহযোগিতা-এতোসবের কোনো প্রয়োজন হতো না।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ–৭

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান দেশপ্রেমিক নেতা। কমিউনিস্ট দেশ গণচীনের সঙ্গে তাঁর একটা সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি নিজে কমিউনিস্ট ছিলেন না। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মওলানা সাহেব ভারতে কার্যত গৃহবন্দী ছিলেন। তবু, স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা নিয়ে আওয়ামী লীগও তেমন কোন বিতর্ক করে না। তবে কমিউনিস্ট না হয়েও তিনি যে সকল কমিউনিস্ট (চীনপন্থী বলে পরিচিত) নেতা এবং সংগঠনকে বিপদের সময় সাহায্য করতেন, তাঁর স্নেহের ছায়ায়-আগলে রাখতেন, তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। কখনো কখনো তাদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী বলেও অপপ্রচার চালানো হয়। এ অপপ্রচারের নির্দয় শিকার সাবেক 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' এবং তার নেতা সিরাজ শিকদার। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর এবং তাঁর সংগঠনের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে যখন ইয়াহিয়া-ভুট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে 'টাগ অব ওয়ার' চলছিল, তখনই সিরাজ শিকদার 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' কায়েমের আওয়াজ তোলেন। ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি ছিল পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সেদিন সিরাজ শিকদার সংগঠনের নেতা, কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল সমর্থক, বিপ্লবী জনগণ এবং দেশপ্রেমিকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; একটি স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে রূপ দিন; স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ দলিলপত্র' দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১৫ থেকে ৬১৮ পৃষ্ঠায় তাঁর সে আহবান সন্নিবেশিত আছে। ঐতিহাসিক সে দলিলপত্র থেকে বক্তব্যটি হুবহু তুলে ধরা হলো- "পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন মার্কসবাদ-লেলিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োগের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত রেখে দৃঢ় পদক্ষেপে তার প্রতিষ্ঠার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করছে।

এ তিন বছর পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা আত্মবলিদান ও কঠোর সংগ্রাম দ্বারা আনন্দ ও বেদনার মহা-উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছে এবং পূর্ব বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে মহান গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

www.pathagar.com

সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণী ও বিপ্লবীদের সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রভাবে পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীরা 'প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত' এ পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকেই পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ ও খুদে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও তার প্রকাশের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করছে এবং বিপ্লবী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার প্রণয়ন করেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তির সঠিক রাজনৈতিক লাইন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ সূচনার সঠিক সামরিক লাইন এবং গোপনভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার সঠিক সাংগঠনিক লাইন।

'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের' কর্মীরা মার্কসবাদ-লেলিনবাদ-মাও সেতুং চিন্তাধারা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ, কৃষক শ্রমিকের সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং বিপ্লবী ঝড়-তরঙ্গে পোড় খেয়ে অধিকতর পরিপক্ক হয়েছেন এবং অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে বিপ্লবীকার্য পরিচালনা করছেন।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলনের এ তিন বছর সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনা ও পরিচালনা করার আত্মগত প্রস্তুতির সৃষ্টি করেছে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পাকিস্তান কাউন্সিল কেন্দ্রে, অফিস ও মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে এবং পূর্ববাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সশস্ত্র প্রতিরোধের সূচনা করে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী একটি পাতা নড়ার শব্দেই আঁৎকে উঠে এবং পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠে। তাদের এ জঘন্য প্রচেষ্টায় শামিল হয় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী দালালরা এবং পূর্ব বাংলার দক্ষিণপন্থী ও আকৃতিগত ভাবে বামপন্থী কিন্তু সারবস্তুগতভাবে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা।

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনে কার্যরত পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে গ্রেফতার করেছে, আরো অনেকের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে গ্রেফতারী পরোয়ানা।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার জনগণের রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস পূর্ব বাংলার এ সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ কারার অন্তরালে অশেষ নির্যাতন ও কষ্টে ভুগছেন। তাদের কথা মনে পড়ে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা বেদনাকে শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং অশ্রুকে শত্রু ধ্বংসের বজ্রকঠিন শপথে রূপান্তরিত করে নিজেদের শক্তিকে সুসংবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করে, বিপ্লবী কাজ দ্বিগুণভাবে জোরদার করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে গ্রাম্য এলাকায় সম্প্রসারিত করে।

পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের গেরিলারা সাফল্যজনকভাবে পূর্ব বাংলার বুকে সর্বপ্রথম সূর্যসেনের দেশ চট্টলায় এবং সন্ন্যাস বিদ্রোহের দেশ ময়মনসিংহে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন তার বিকাশের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে।

পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দ্ব প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। স্মরণাতীতকালের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বলিদান প্রমাণ করেছে পূর্ব বাংলার পরাধীনতার চরিত্রকে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সংগ্রামকে নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের কানাগলিপথে পরিচালনার ষড়যন্ত্র করছে এবং এ উদ্দেশ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় এবং আইনগত কাঠামোর আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে।

আওয়ামী লীগ জনতাকে এর বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে এ ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে এবং পূর্ব বাংলার উপরস্থ শোষণ-নিপীড়ন সমাধানের জন্যে শান্তিপূর্ণ ও সংস্কারবাদী পথ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে।

পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রধান উপাদান হলো সামরিক বাহিনী। পূর্ব বাংলার জনগণের কোনো উপকারই করা সম্ভব নয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমিতে গণবিরোধী এ সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করা ব্যতীত। শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক, সংস্কারবাদী সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আপোস ও আঁতাত এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই আওয়ামী লীগের সামনে সশস্ত্র সংগ্রাম ও আপোসের দুটো পথ খোলা রয়েছে। আওয়ামী লীগের শ্রেণীভিত্তি প্রমাণ করে এরা শেষোক্ত পথ অনুসরণ করেছে যার পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টি ও তার মাধ্যমে পরিচালিত সর্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সমাজতন্ত্রের সারবস্তু হলো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। এটা জনগণের পরিবর্তে দুর্নীতিপরায়ণ আমলা-ম্যানেজার প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। এর পরিণতি হলো লোকসানের প্রতিষ্ঠান ইপিআরটিসি বা ইপিআইডিসি এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা।

তথাকথিত মুক্ত পৃথিবীর প্রধান মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কমিউনিজম প্রতিহত করার এটা একটি নতুন কৌশল। বার্মার নে-উইন, সিঙ্গাপুরের লি-কান-উয়ে, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের নামে পুরনো শোষণকে নতুন শোষণের রূপে তীব্রতর করছে এবং কমিউনিস্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিজম প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়ছে।

শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র ও শোষণের অবসানের কথা বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনতা ও তাদের নেতৃত্বকে 'জ্যান্ত কবরস্থ' করা এবং পূর্ব বাংলার চিয়াংকাইশেক, নে-উইন, ইন্দিরা, লি-কান-উইয়ের ভূমিকা পালন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সামরিক শাসকগোষ্ঠী এ কারণেই তাদেরকে কিছুটা সুবিধা প্রদান করে পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের পরিচালিত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙ্গালীদের দ্বারা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে।

ইতিহাস সকল ভাঁড় ও ভাঁওতাবাজদের আগে হোক পরে হোক চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবেই। পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনতার পরিচালিত ইতিহাসের চাকা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করেছে; এটা নিজস্ব গতিপথে অনিবার্যভাবেই তাদেরকে গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে চূড়ান্তভাবে কবরস্থ করবে।

আমরা অবশ্যই এ সত্য প্রতিনিয়ত জনতার সামনে তুলে ধরবো এবং বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে উঠতি বুর্জোয়াদের মোহগ্রস্ত জনগণকে আমাদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা জোরদার করবো। এ উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাম্য এলাকায় কৃষকদের জাতীয় শত্রুবিরোধী খতম অভিযান জোরদার করবো। এভাবে পূর্ব বাংলার ৮০ ভাগ জনতার নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে শহরে বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হবো।

www.pathagar.com

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। মহান নেতা সভাপতি মাও যথাযথভাবে বর্তমান দুনিয়ার বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছেন, 'বিপ্লব হলো বর্তমান বিশ্বের প্রধান প্রবণতা'। বিশ্বের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, বর্মা, ভারত, প্যালেস্টাইন এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলছে।

খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মর্মস্থলে কালো অধিবাসীদের হিংসাত্মক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে। সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সংশোধনবাদী দেশসমূহে গণঅসন্তোষ এবং নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। তারাও নিজের খতমের দিন গুনছে।

পক্ষান্তরে সভাপতি মাওয়ের নেতৃত্বে গণচীন বিরাটকায় দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব দিগন্তে, ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আলোকস্তম্ভ আলবেনিয়া উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করছে।

এ যুগ সম্পর্কে সভাপতি মাও দূরদর্শিতার সাথে যথার্থই উল্লেখ করেছেন, 'আজ থেকে আগামী ৫০ বছর থেকে ১০০ বছর অথবা তার পরের সময়টা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মহান যুগ। পূর্ববর্তী যে কোনো ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে নজিরবিহীন একটি বিশ্ব কাঁপানো যুগ।'

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ১৯৭০-এ পূর্ব বাংলার জনগণের যে গণযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা দাবানলের রূপ নেবে ১৯৭১-এ। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলবে গণযুদ্ধের দাবাগ্নি, আর তাতে পুড়ে মরবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শত্রুরা, তাদের দালাল, বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীরা। এই প্রবল ঝড়-তরঙ্গে থর থর করে কাঁপবে পুরোনো দুনিয়া, গড়ে উঠবে জনগণের গেরিলাবাহিনী, সমাপ্ত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি। সংগঠন হিসেবে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি।"

সিরাজ শিকদারের রাজনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ তাঁর সংগঠনের রণনীতি এমনকি রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ পদ্ধতি বা রণকৌশলের সঙ্গে অনেকেই একমত না হতে পারেন, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নের সঙ্গেও দ্বিমত থাকতে পারে। এটা স্বাভাবিক। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে একটি বিপ্লবী সংগঠনের দ্বিমত থাকবেই। কিন্তু মূল জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্নে, অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কারো সঙ্গে তাঁর দ্বিমত ছিলো

www.pathagar.com

না। তবে হ্যাঁ, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপ কি হবে সে সম্পর্কে তাঁর অন্যদের থেকে আলাদা। স্বাধীন স্বদেশে তিনি শ্রমিক শ্রেণী তথা সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য এবং তাঁর দলের কোনো দ্বন্দ্ব ছিলো না, দ্বন্দ্ব ছিলো সমাজ ব্যবস্থা, অন্য দল ও নেতৃত্বের সঙ্গে। ইতিহাসের এই সত্যকে স্বীকার করতেই হবে।

সর্বহারা পার্টি এবং তার নেতা সিরাজ সিকদারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকে একটানা অপপ্রচার চালানো হয় যে, তিনি এবং তার দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কেউ কেউ তাকে রাজাকারের পর্যায়ভুক্তও করে ছেড়েছেন। কিন্তু তা ছিল ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি। সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে আমরা বা অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারি, কিন্তু তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী একজন রাজনীতিকের অপবাদ দেয়া যাবে না। তাঁর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হবে যে, তিনি ছিলেন একজন অসম সাহসী দেশপ্রেমিক। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেই কারো দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা নির্দয় রাজনৈতিক আচরণ এবং হীন মানসিকতার পরিচায়ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর পার্টির নাম ছিল 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন'। সংগঠনটি সর্বহারা পার্টি নাম ধারণ করে স্বাধীনতার পর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনের সমুদয় কৃতিত্ব দাবি করে আওয়ামী লীগ। অথচ ২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষে তাদের স্পষ্ট কোনো ভূমিকাই ছিল না। বরং তারা তখন পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় একটা ফয়সালার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে গেছে। কখনো ইয়াহিয়া-মুজিব, কখনো বা ইয়াহিয়া–ভুট্টো-মুজিব আলোচনা এর সাক্ষী হয়ে আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এই সিরিয়ালের শেষাংশে। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছেন, পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন চালিয়েছেন, জনগণের সামনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক–নির্দেশনা হাজির করেছেন তাদের সকলের কাছেই জাতি কৃতজ্ঞ। এদেশের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির (পিকিংপন্থী বলে যারা এককালে পরিচিত ছিলেন) ভূমিকাটা প্রথমদিকে আলোচনায় আনা হয়েছে এই কারণে যে, মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই শক্তির ভূমিকা ছিল প্রকাশ্য এবং খুবই স্পষ্ট। এদের ভূমিকা ও অবদানকে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে কেউ অস্বীকার করলেও ইতিহাস তা করে না।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ–৮

বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

তারিখ ঃ ২ মার্চ, ১৯৭১

আপনার ও আপনার পার্টির ছয়-দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়-দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে।

আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ব-বাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ব-বাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য 'পূর্ব–বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি পেশ করছে ঃ

(১) পূর্ব-বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।

(২) পূর্ব–বাংলার কৃষক–শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব–বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

প্রয়োজনবোধে এ সরকারের কেন্দ্রীয় দফতর নিরপেক্ষ দেশে স্থানান্তরিত করুন।

(৩) পূর্ব-বাংলাব্যাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনার আহ্বান জানান।

এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহ্বান জানান।

(৪) পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব-বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' বা 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠন করুন।

www.pathagar.com

(৫) প্রকাশ্যে ও গোপনে, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

(৬) পূর্ব-বাংলার প্রজাতন্ত্র নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে ঃ

(ক) পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে উৎখাত করা এবং পূর্ব-বাংলাস্থ তাদের সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। ঔপনিবেশিক সরকারের সকল প্রকার শোষণ ও অসম চুক্তির অবসান করা। এদের দালালদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এদের মধ্যে সনাতনদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(খ) পূর্ব–বাংলার জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করা। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-দেশপ্রেমিকদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

(গ) গ্রাম্য এলাকায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমি শোষণের অবসান করা। সরকারি খাসভূমি এবং বিশ্বাসঘাতক জমিদার–জোতদার ও অন্যান্য দেশদ্রোহীদের ভূ-সম্পত্তি-ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা। দেশপ্রেমিক জমিদার-জোতদারদের পরিচালিত শোষণ হ্রাস করা।

(ঘ) শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রম সময়, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা।

(চ) ছাত্র–শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ন্যায্য দাবি–দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা।

(ছ) ধর্মীয়, ভাষাগত ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।

(জ) পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসম উন্নতির সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও পোকা এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) জাতীয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, খেলাধুলা ও শরীর গঠনের ব্যবস্থা করা।

(ট) পঞ্চশিলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

(ঠ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম সমর্থন করা।

(ড) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পূর্ব–বাংলাস্থ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া-ইয়াকুবের বেয়নেট-বুলেটের নিকট আত্মসমর্পণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মেনে নেয়া বা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার এ দুটো পথ পূর্ব- বাংলার জনগণের সামনে খোলা রয়েছে।

পূর্ব-বাংলার জনগণ রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করেছেন স্বাধীনতার চাইতে প্রিয় তাদের নিকট আর কিছুই নেই।

আপনি ও আপনার পার্টি অবশ্যই উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে জনতার এ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করবেন। অন্যথায় পূর্ব-বাংলার জনগণ কখনোই আপনাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না।

পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা-জিন্দাবাদ,

পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-জিন্দাবাদ,

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তার দালালদের খতম করুন,

গ্রামে-শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন,

"সমস্ত দেশপ্রেমিকদের-ঐক্যবদ্ধ করুন।"

একাত্তরের ২ মার্চ সিরাজ সিকদার পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের নামে দেশব্যাপী যে প্রচারপত্রটি বিলি করেছিলেন, তা পাঠের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সিরাজ সিকদারের ভূমিকাকে যারা কলংকিত করতে চান, তাঁর এবং তাঁর সংগঠনের অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তাদের ঘৃণা করা ছাড়া আর কী করার আছে? আওয়ামী লীগ এবং তাদের সাবেক মস্কোপন্থী ধামাধরা বি. টিম প্রকৃত স্বাধীনতাকামীদের সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য। পাকিস্তানের দাসত্বের শৃংখল ছেঁড়া বাংলাদেশকে তারা তাদের প্রভু রাষ্ট্রের বন্দীত্বের শেকলে বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু ওই দেশপ্রেমিক বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ছিলো অন্তরায়। তাই তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করার কুমতলবেই করা হয়েছিল যতো মিথ্যাচার।

সিরাজ সিকদারের পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের ২ মার্চ, একাত্তরে প্রচারিত প্রচারপত্রটি নিছক একটি প্রচারপত্রই ছিলো না, তা ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে একজন বামপন্থী দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতা ও তাঁর সংগঠনের অঙ্গীকারের ঘোষণাপত্র এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এরপরও যারা সিরাজ সিকদারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলেন অথবা রাজাকার-আলবদর, আল-শামস্-এর পর্যায়ভুক্ত করেন তারা ইতিহাস বিকৃতির দায়ে একদিন অবশ্যই ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে দাঁড়াবেন। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেও যাকে ইতিহাসের পাতা এবং জনগণের মন-মন্দির থেকে অপসৃত করা যায়নি, স্বাধীনতা আন্দোলনে সে দেশপ্রেমিক বীরের ভূমিকাকেও ম্লান করা যাবে না কখনো।

www.pathagar.com

আগের নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' এবং সিরাজ সিকদারের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে এবং ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু সত্য বাণী তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল স্বাধীনতাকামী জনগণের ক্ষুব্ধ-বিস্ফোরণের মাস। দেশবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ, ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন যখন স্থগিত হয়ে যায়, সিরাজ সিকদার এবং তাঁর সংগঠন তখনই তাদের করণীয় নির্ধারণ করে ফেলেন। তারা একদিকে জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন, অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আপোসের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার পথ বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানান। অবশ্য দেশের নাম বাংলাদেশের স্থলে তারা ব্যবহার করেছিলেন 'স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্র'। স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তারা একটি প্রচারপত্র বিলি করেন ১৯৭১ সালের ২ মার্চ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দলিলপত্রের ৬৬৩, ৬৬৪ ও ৬৬৫ পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ আছে। প্রচারপত্রটি হুবহু তুলে ধরা হলো ঃ

"শেখ-মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশেও পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের খোলা চিঠি পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও-১

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। অপপ্রচার হচ্ছে যে, এটি একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য, আন্তর্জাতিক মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নিরাপদ আস্তানা ইত্যাদি। সমানতালে বলে বেড়ানো হচ্ছে, হিন্দুদের এ দেশে মেরেকুটে শেষ করে দেয়া হচ্ছে, জান-মাল ইজ্জতের ভয়ে তারা দেশান্তরী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে, গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই বাংলাদেশে, মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত। বলাবাহুল্য, চারদলীয় জোট সরকার গঠন করার পর পরই এই ধরনের রাষ্ট্রঘাতী গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ ও একশ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিসেবী। পরবর্তীরা আওয়ামী লীগের অনুগত, নিয়ন্ত্রিত ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য। পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ কাজের সুবিধার জন্য তারা একটি শক্তিশালী মিডিয়া নেটওয়ার্কও গড়ে তুলেছে।

১৯৯৮ সালে চারদলীয় জোট গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্ররা তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে যে, 'রাজাকার-স্বৈরাচার-এর সঙ্গে বিএনপি আঁতাত করেছে। বিএনপি এদের নিয়ে গণতন্ত্র নস্যাৎ করে একটি তালেবানি রাষ্ট্র গঠনের জন্য জোট করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী সকলকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' একসঙ্গে কলের গান বেজে ওঠে পরিত্যক্ত বাম শিবিরে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের সদরে-অন্দরে। মুনতাসির, আবেদ খান, মমতাজ উদ্দিন, কবির চৌধুরী গং শুরু করে মিথ্যা কলমবাজি। সরকারি-বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অধিকাংশও ডুগডুগি বাজাতে থাকে। আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন দুহাজার সালের ২০ মার্চ এবং অবস্থান করেছেন দুই দিন। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে তারা সরকারিভাবে দুটি পুস্তক প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশে তালেবানরা বিএনপি-জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছে এখানে। ক্লিনটনের কর্মসূচিতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কথা ছিল। সকল বিদেশী মেহমানই সেখানে গিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সম্মান দেখান। কিন্তু বাংলাদেশে আসার পর ক্লিনটনের সেই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায়। মার্কিন গোয়েন্দারা লীগ

www.pathagar.com

সরকারের অপপ্রচার ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের সূত্র ধরে তাদের প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বাংলাদেশে তালেবান আছে এটা প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবে তৎকালীন সরকার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাব সৃষ্টির কৌশল হিসেবে এ ঘৃণ্য পথ অনুসরণ করে তারা। নিজের লাভ নিশ্চিত করতে গিয়ে সরকারে থেকেও দেশের ক্ষতি করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। এ থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছিল, তাদের সরকারের ওপর জনগণ অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ এবং তাদের গণভিত্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি তাদের প্রতিপক্ষ চারদলীয় জোট আবির্ভূত হয়েছে প্রবল গণসমর্থন নিয়ে। তাই ক্ষমতার দুর্বল ভিতকে মজবুত করার লক্ষ্যে এবং চারদলীয় জোট সম্পর্কে দেশে-বিদেশে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিজেদের পক্ষে সমর্থন-সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যা-ভিত্তিহীন গোয়েবলসীয় প্রচারের অপকৌশল অবলম্বন করে। সে অপকৌশল শুধু তাদের জন্য নয়, দেশের জন্যও বুমেরাং হয়।

বিএনপির দেশপ্রেমিক চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসী ওয়াকিবহাল। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল করে থাকতে পারে কিন্তু সজ্ঞানে দেশের ক্ষতি হতে পারে তেমন কোনো কাজ করেনি। এমনকি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালেও তারা সরকারের বিরোধীতা করতে গিয়ে দেশবিরোধী, গণস্বার্থ বিরোধী বা রাষ্ট্রঘাতী কোনো তৎপরতা চালায়নি। একটি ফ্যাসিবাদী সরকারের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনগণ তাই পারস্পরিক রাজনৈতিক মত-পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চারদলীয় জোট গঠনকে স্বাগত জানায় এবং তাদের পেছনে কাতারবন্দী হয়। জনগণ নিশ্চিত যে, বাংলাদেশে তালেবান বা কোনো আন্তর্জাতিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর আস্তানা নেই। দেশবাসী স্পষ্টই বুঝতে পারেন, সংখ্যালঘু সমর্থন অটুট ও অব্যাহত রাখা, ভারতীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা আরো জোরদার করা এবং বিশ্বজুড়ে আমেরিকার কথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে তাদের করুণা-অনুকম্পা লাভের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকেই জাতীয় স্বার্থবিনাশী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। এতে তাদের অবস্থান জনগণের মধ্যে আরো নাজুক হয়ে পড়ে, যার প্রতিফলন ঘটে ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে। জনগণের রায় হয় উভয়ের জন্যই অপ্রত্যাশিত। আওয়ামী লীগ কল্পনাও করতে পারেনি তারা এতো কম আসন পাবে, বিএনপিও নিশ্চয়ই এতো বেশি আসন আশা করেনি। অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফলকে ১৯৫৪ এবং

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কৃতিত্বের চেয়ে জনগণের সিদ্ধান্ত ও ভূমিকাই তাতে মুখ্য ছিল। বলাই বাহুল্য যে, ক্ষমতাসীনদের আচরণই জনগণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়মক ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগকে জনগণ নির্বাচনে শিক্ষা দিয়েছে ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের দেশ, জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও আচরণের জন্য। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে চারদলীয় জোটের চরিত্রহননের সকল আওয়ামী প্রয়াস তাই শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়। একটা কথা সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের শতকরা নব্বইজন মানুষ মুসলমান। পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারে তারা ব্যথিত হয়, অত্যাচারীকে ভীষণ অপছন্দ করে। কার্যকর কোন সাহায্য করতে না পারলেও বসনিয়া-হারজেগোভিনা, চেচনিয়ায় কিংবা আফগানিস্তানে নির্বিচারে নির্দোষ মুসলিম নিধনে তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর এমনকি ইরাকী মুসলমানদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। কি ক্ষমতায়, কি ক্ষমতার বাইরে, কোন ব্যক্তি বা দল যদি এদেশের মানুষের এই সংবেদনশীল জায়গাটিতে ক্ষতের সৃষ্টি করে, জনগণের পপুলার সাপোর্ট তারা আশা করতে পারে না। গত নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। লীগ সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা আন্তর্জাতিকভাবে দেশের জন্যও ব্যুমেরাং হয়েছে। দেশে তালেবান আছে, বিভিন্নস্থানে ট্রেনিং নিচ্ছে চারদলীয় জোটের পৃষ্ঠপোষকতায়, সরকারিভাবে এই ভিত্তিহীন প্রচারে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ তার কোন কোন মিত্র তৎকালীন লীগ সরকারের 'গায়েবী' প্রচারকে আমলে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকাভুক্ত করার পেছনে পতিত লীগ সরকারের সেদিনের ঘৃণিত কর্মকাণ্ডও সূত্র হিসেবে কাজ করেছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

বিরোধী দলে এসেও আওয়ামী লীগ অপপ্রচারে গোয়েবলসীয় অতীত ধারা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি এলাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই তাদের প্রধান এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। যারা বিভিন্ন দেশে আল কায়দা-তালেবান খুঁজছে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌক্তিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী দেশ বলছে না, বলছে না যে এখানে সন্ত্রাসীদের কোনো ঘাঁটি আছে। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বরং বলছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিরোধী কোয়ালিশনের এক বিশ্বস্ত সদস্য বাংলাদেশ। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশে নিযুক্ত

www.pathagar.com

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরী এ্যান পিটার্সসহ অনেকেই বলেছেন, কেউ কেউ এখনো বলছেন যে, বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশে আল কায়দা-তালেবানের কোনো ঘাঁটি নেই। অথচ আওয়ামী লীগ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গনা বলছে – না, তোমরা জান না, বাংলাদেশে ওসব আছে, জোট সরকার গোপনে ওদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে। বাংলাদেশে কথিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণের অলীক কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তারা কাজে লাগাচ্ছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ ও তাদের স্বপক্ষীয় কিছু জ্ঞানপাপী লেখক–সাংবাদিক–বুদ্ধিজীবীকে।

পৃথিবীর যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকার আছে, বিরোধী দলও আছে। আছে সরকারের কঠোর সমালোচনা। কিন্তু সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে এমন কোনো কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ এবং উচ্চারণ তারা করেন না, যা দেশের জন্য ক্ষতিকর। বরং জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে বোঝা যায় না কে সরকারে, কে বিরোধী দলে। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকালেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেখ হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে ত্রিশ বছরের অসম পানি চুক্তির কথাই ধরা যাক। ওই চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে ভারতের স্বার্থ আদায় করা হয়েছে ষোল আনার ওপর বত্রিশ আনা। আর সেই চুক্তি সম্পাদনের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেন সে দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল সিপি-এম–এর নেতা জ্যোতিবসু। কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধী দলও তাতে সমর্থন জানায়। বিজেপি সরকারের ভাণ্ডারে কৃতিত্ব জমা হবে এ চিন্তা তারা কেউ করেনি, তারা দেখেছে ভারতের লাভ। কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের কোনো দলের মধ্যেই নীতিগত পার্থক্য নেই। ক্ষমতাসীনদের যে কোনো এ্যাকশনের পক্ষে দাঁড়ায় সকল দল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা জওয়াহের লাল নেহরুর গণতান্ত্রিক ভারত এখন সাম্প্রদায়িক ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে নিবিড় সখ্য গড়েছে, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'র' একযোগে কোনো কোনো বিষয়ে কাজ করছে, ইসরাইল এখন ভারতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতের কোন কোনো রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে বাজপেয়ী সরকারের এই অবস্থানের পক্ষে নয় বলে শোনা যায়। কিন্তু এ ইস্যুতে সরকারের বিরোধিতা করতে গেলে দেশের ক্ষতি হতে পারে ভেবে প্রকাশ্যে কোনো দল এর বিরোধিতা করছে না। ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের এই নতুন সম্পর্কের ব্যাপারে সে দেশের বিরোধী দলসমূহের প্রকৃত অবস্থান জানার সুযোগ পর্যন্ত নেই। আমাদের দেশে এমন কিছু কি এখন কল্পনা করা যায়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতো ভারতে 'ডালভাত'। প্রায়ই কোথাও না কোথাও দাঙ্গা হচ্ছেই। জানমাল হারাচ্ছে মুসলমানরা। ভারতের কোনো

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল বা নেতা ইউরোপ –আমেরিকায় গিয়ে এ ব্যাপারে কখনো কি মুখ খুলেছেন? সে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু দেশের বাইরে কোনো নেতা বা দল এ ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সে নজির নেই। অভ্যন্তরে যাই ঘটুক, বহির্বিশ্বে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির সামান্যতম ক্ষতি হোক তা চায় না বলে বাইরে গিয়ে কেউ সরকারের বিরুদ্ধেও কোনো কথা বলে না। অথচ কি দুর্ভাগ্য আমাদের, একটি পুরনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ক্ষুদ্র দলীয়, গোষ্ঠীগত ও পারিবারিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে পারে না। দেশের চেয়ে তাদের কাছে দল বড়, তার চেয়ে বড় একটি পরিবার ও ব্যক্তি বিশেষ। ক্ষমতার প্রশ্নে সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের কাছে কোনো প্রভেদ রেখা নেই। তারা ক্ষমতায় না থাকলে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও তাদের কাছে দুশমন হয়ে যায়। সরকারকে ঘায়েল করতে গিয়ে রাষ্ট্রের পায়ে কুড়াল মারার সময় তারা এতোই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন যে, ভুলে যান এ কুড়াল তারা মারছেন নিজের পায়েও। কারণ সরকার কোন দল বা জোটের হতে পারে, কিন্তু দেশটা সকলের, সমগ্র জনগণের। দেশ থাকলেই সরকার থাকবে, দল থাকবে, থাকবে রাজনীতি। আর থাকবে একটি স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক অহংকার।

এই বিবেচনাবোধ আওয়ামী লীগের মধ্যে লোপ পেয়েছে বলেই মনে হয়। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রতি নজর দিলেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং সেসবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগীদের সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যা চলছে, তার সূচনা হয় অষ্টম সংসদ নির্বাচনের পরদিন থেকেই। জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে জিঘাংসামূলক মানসিকতা নিয়ে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত হয়। দু'হাজার এক সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ যে নীরব ব্যালট বিপ্লব ঘটায়, তা থেকে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আন্দোলন গড়ে তোলা যে অসম্ভব, লীগ নেতারা তা জানতেন। ক'দিনের মধ্যে জনগণ তা বুঝিয়েও দেয়। কিন্তু ক্ষমতা হারাবার যন্ত্রণা-কাতর আওয়ামী লীগ তাতে সংযত হয়নি, বরং দেশের জনগণের ওপর ভরসা না করে বহির্বিশ্বে বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারকে হেয় করার এবং বিদেশী সহানুভূতি সমর্থন নিয়ে কাবু করার নতুন রণকৌশল নির্ধারণ করে। নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে শেখ হাসিনা খুবই আশাবাদী ছিলেন। ২০০১ সালের ৩১ অক্টোবর ধানমণ্ডির সুধাসদনে আয়োজিত এক প্রেসব্রিফিং-এ তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে তার দল ১৭০ থেকে ১৮০ আসনে বিজয়ী হবে। পরদিন, অর্থাৎ ভোটের দিন এ সংখ্যা তিনি আরেকটু বাড়িয়ে ১৯০ ছুঁয়েছিলেন।

ভোটের দিন শেখ হাসিনা নিজের ভোট দিয়ে দু'ঘণ্টা ঢাকার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তখন তিনি ছিলেন বেশ উৎফুল্ল। ২ অক্টোবর দৈনিক জনকণ্ঠ তাঁর প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে এভাবে-"আমি আজ আনন্দিত। এতকাল জনগণের ভোটের অধিকার ছিলো না। ভোট মানেই ছিলো গুণ্ডা, হোন্ডা, সিলমারা, বাক্স ভরা ইত্যাদি। অনেক আন্দোলন -সংগ্রাম করে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি।" গণভবন সরকারি হাইস্কুল কেন্দ্রে ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, প্রায় সবক'টি জাতীয় দৈনিকে এবং টিভি নেটওয়ার্কে তা অবিকৃত এবং প্রায় একইভাবে উপস্থাপিত হয়। সকলে শেখ হাসিনাকে উদ্ধৃত করে সংবাদ ছাপে এবং প্রচার করে যে, তিনি বলেছেন, "ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ভোটারদের উপস্থিতিতে আমি খুশি। মানুষ ভোট দিতে পারছে"। অর্থাৎ ভোটের দিন পর্যন্ত ভোট নিয়ে তার কোনো অভিযোগ ছিলো না। তিনি এতোটাই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রকাশ্যে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে জনগণকে সহাস্যে আগাম ধারণা দিয়েছিলেন, তার দল এবং তিনিই পরবর্তী সরকার গঠন করবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু পয়লা অক্টোবরের রাত যতো গভীর হতে থাকে, তার মাথাও ততো বিগড়াতে থাকে। পরদিন অর্থাৎ ২ অক্টোবরের সকাল সূর্যরশ্মি যখন দেশের অবহেলিত, অত্যাচারিত, নিগৃহীত মানুষের চোখে-মুখে আনন্দের আলো ছড়ায়, ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাড়ি এবং শেখ হাসিনার অবহেলিত স্বামী ডক্টর ওয়াজেদের সুধাসদনে তখন নেমে আসে বিষাদের কালো মেঘ। লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে লীগ পরিবারকে। পরদিনই তড়িঘড়ি করে আয়োজন করা হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের। ১ অক্টোবর কি বলেছিলেন, ২ অক্টোবরেই তা বেমালুম ভুলে যান শেখ হাসিনা। একটি জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে পুংখানুপুংখ খবরা-খবর সংগ্রহ করে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের কোনো সময় না নিয়েই তিনি বলে ফেললেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। তাদের বিজয় নাকি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি ভোটের ফল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন ও ভোটারদের অপমান করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এবার আর সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি হয়েছে। চক্রান্ত করে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে নির্বাচনের মোড়। নষ্ট করা হয়েছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। ১৫ জুলাই আমাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই প্রণীত হয় নীলনকশা। এবার ভোট কেন্দ্রে জনগণের উপস্থিতি ছিলো অনেক বেশি। এটি ছিলো সামনের চিত্র। পেছনে বাস্তবায়ন করা হয়েছে নীল নকশা।' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'এটি ছিলো আমার কনসেপ্ট। কিন্তু বেড়ায় ক্ষেত খেয়ে ফেলবে তা আগে বুঝিনি।' সংসদে যোগদান না করার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, 'যাওয়ার দরকার কি? খেতে যখন চায়, সবটুকুই খাক' (জনকণ্ঠ, ২.১০.২০০১)। কি সব ছেলে মানুষী কথাবার্তা! একজন জাতীয় নেত্রীর মান অনুযায়ী তিনি সেদিন কথা বলেননি। তার বক্তব্যে ভোটের কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণও ছিলো না। তার সুরটাই ছিলো এমন যে, আওয়ামী লীগ এবং শেখ পরিবারই বাংলাদেশের মালিক মোক্তার। এদেশের জনগণ তাদের প্রজা। দেশ শাসনের অধিকার একমাত্র তাদেরই। প্রজা কেন রাজা হবে?

নির্বাচনের পর সকরার গঠনের আগেই তারা একটি রাজনৈতিক চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। ৩ অক্টোবর ভোট কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় ৩০০ আসনে ভোটের দাবি জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং চারদলীয় জোট মিলে তার দলকে হারিয়ে দিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল আমরা মানি না। ১০ অক্টোবরের মধ্যে ৩শ' আসনের নির্বাচন

www.pathagar.com

বাতিল করে আবার সব আসনে ভোট দিতে হবে, নতুবা ১১ অক্টোবর থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে।' ১০ অক্টোবর তারা সারাদেশে অবরোধ ডেকেছিলেন। কিন্তু জনগণ সে ডাকে সাড়া দেয়নি। এই অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণার পেছনেও একটা ব্যর্থতার জের ছিলো। সরকার গঠনের আগেই তারা নির্বাচন বাতিল করে দেয়ার অসাংবিধানিক অগণতান্ত্রিক দাবিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। একদিকে শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি, অপরদিকে জোটসহ অন্যান্য এমপিদের শপথ গ্রহণে তাদের তৎকালীন দলীয় স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদের টালবাহানার উদ্দেশ্যই ছিলো সময় ক্ষেপণ ও ষড়যন্ত্রে কামিয়াব হওয়া। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত যে, ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়নি।

এই চক্রান্তের কথা জাতির কাছে ফাঁস করে দেন বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদ। হয়তো তিনি তা করতেন না, যদি তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ মিথ্যা অপবাদ না দিতো। প্রথমে তারা প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু সাইয়িদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলো। পরে বিচারপতি সাহাবউদ্দীনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেয়ার জন্য তিনিও জোটের পক্ষে ছিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্টকে তারা বিশ্বাসঘাতক বলেও গালি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালেই প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি সাহাবউদ্দীন আহমদের নাম প্রস্তাব করে এবং তিনি সকল দলের সমর্থনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগারদের বক্তব্যটা ছিলো এমন যে, 'আমরা তোমাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছি, আমরা যা বলবো তাই তোমাকে শুনতে হবে'। কিন্তু বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি তার বিচারক-বিবেচনাকে বিসর্জন দিতে পারেননি। অন্যায়, অসাংবিধানিক ও অনৈতিক দাবি ও চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। দেশে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা অটুট রাখার স্বার্থে তার অনমনীয় ভূমিকার কারণেই সরকার গঠনের আগে দেশ একটি সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। আওয়ামী লীগ এবং স্বয়ং শেখ হাসিনার অব্যাহত আক্রমণের মুখে বেশ কিছুদিন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। কিন্তু চরিত্র হননের মাত্রা যখন সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করে তখন তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হন। ২০০২ সালের ৪ জানুয়ারি বিচারপতি সাহাবউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে তাঁর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের আনীত সকল অভিযোগ খণ্ডন করে প্রকৃত ঘটনার সঠিক চিত্র তুলে ধরেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে এবং ভবিষ্যতে ইতিহাস রচয়িতাদের সুবিধার্থে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবউদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত

www.pathagar.com

ও তার লালমাটিয়াস্থ বাসভবনের ঠিকানা থেকে ব্যক্তিগত সহকারীর পাঠানো 'মিথ্যাচারের প্রতিবাদ' শিরোনাম দেয়া প্রতিবাদলিপির পূর্ণ ভাষ্য উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"গত কয়েক মাস ধরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন রাজনীতিবিদ এবং কয়েকজন কলাম লেখক প্রায়শ আমার সম্পর্কে অসত্য তথ্য এবং বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। এসব বক্তব্যের সার কথা হলো, অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই হারিয়ে দেওয়ার পেছনে আমারও হাত রয়েছে। আমার আদর্শ, নীতিবোধ নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এসব বিকৃত বক্তব্যের জবাব দেওয়ার ইচ্ছে আমার হয়নি। সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছু শালীনতাবর্জিত বক্তব্য এবং একজন কলাম লেখকের বক্তবে চরম মিথ্যাচার করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

শেখ হাসিনার বক্তব্য নিম্নরূপ–১. রাষ্ট্রপতি বাঙালি জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন. ২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক বাহিনী নামিয়েছেন, ৩. বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার রাষ্ট্রপতির পরামর্শ মতো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে দায়রা আদালতে করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন বলে শেখ হাসিনা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। তিনি বা তার দু–একজন অনুসারী আগেও বলেছেন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমাকে তারা বিশ্বাস করে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মোনাফেকি করেছি। আমি এমন কোনো মুচলেকা দিয়ে রাষ্ট্রপতি হইনি যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন হওয়ার কয়েকদিন আগেও শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে আমাকে বলেছেন যে, আমি রাষ্ট্রপতি ছিলাম বলেই তারা পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে পেরেছেন। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরই তার বক্তব্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেল– আমি হয়ে গেলাম বিশ্বাসঘাতক। হেরে যাওয়ার পরে তারা আমাকে নির্বাচন বাতিল করে রাষ্ট্রপতির অধীনে পুনরায় নির্বাচন করার অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি। সবকিছু তাদের মনের মতো হলে আমি দেবতুল্য, না হলে নরাধম।

নির্বাচনের কিছুদিন আগে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এর পেছনেও তারা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেছেন। অথচ এই সামরিক বাহিনীর প্রধানকে শেখ হাসিনাই মনোনীত করেছেন। সেনা প্রধান তার সঙ্গে একই জনসভায় বলেছেন যে, তিনি রাজাকারদের নির্মূল করবেন। তাহলে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, সেই সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পরে বিজয়ী দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়েছেন? নির্বাচনে

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেছে। তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনের ১০-১২ দিন আগে প্রধান উপদেষ্টা সেনাবাহিনী নিয়োগের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন এবং তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং জয়-পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। এতো শুধু কয়েকজন একদেশদর্শী রাজনীতিবিদ এবং কলাম লেখক যেভাবে অগভীর ও অর্থহীন ব্যাখ্যা করে চলেছেন, তা স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে পৌঁছেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখার স্বার্থে এ ধরনের প্রচারণা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা কিভাবে শুরু করতে হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ মিথ্যাচার বিস্ময়কর। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা সাধারণ আদালতে করতে হবে এমন কোনো পরামর্শ আমি দিইনি। তিনি নিজেই এ মামলা শুরু করেছিলেন। শুরু করার পরে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন যে, বিচার যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয় সে কারণে তিনি সাধারণ আদালতে মামলা করেছেন। এছাড়া দায়রা জজ গোলাম রসুল কেমন ব্যক্তি তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, তিনি ভালো লোক। এর অনেক দিন পরে তিনি জানতে চাইলেন, দায়রা জজের আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হতে দেরি হচ্ছে কেন এবং জিয়া হত্যার পরপরই জেনারেল এরশাদ স্বল্পসময়ে সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে বিচার করে কয়েকদিনের মধ্যে কিভাবে ফাঁসি দিলেন। আমি বলেছিলাম, তাদের 'ফিল্ড কোর্ট মার্শালে' অতি অল্প সময়ে বিচার হয়েছিল। সে মামলার বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে রিট হয়েছিল, তা খারিজ হয়ে যায়। এছাড়া এই মামলা সম্পর্কে তার সঙ্গে আর কোনো আলোচনা হয়নি।

প্রসঙ্গত আর কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সংবিধান অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিযুক্তির এক ঘণ্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলির আদেশ দেন। প্রধান উপদেষ্টার এই আদেশের এক ঘণ্টা পরে চারজন সচিব বিষয়টি আমাকে জানায়। তখন আমি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছি। এরপর প্রধান উপদেষ্টা আমাকে জানান, আওয়ামী লীগ সরকার মেয়াদ শেষ হওয়ার মাসখানেক আগে প্রায় দেড় হাজার অফিসারকে বদলি করেছে এবং নির্বাচনে সুবিধা লাভের জন্য এসব বদলি করা হয়েছে। এ জন্যই তিনি দ্রুতগতিতে বদলির কাজে হাত দেন।

www.pathagar.com

প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আমার পরামর্শ মতো নিয়োগ করা হয়েছে বলে যে কথা উঠেছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই তাকে মনোনীত করেছিলেন।

গত নভেম্বর–ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'পোট্রেট অফ এ ট্রেটর' নামে ধারাবাহিকভাবে যে লেখাটি লিখেছেন তা মিথ্যাচারের একটি অপূর্ব নিদর্শন। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী স্বনামধন্য লেখক। একুশে সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি যে এতটা মিথ্যাচার করতে পারেন তা ভাবা যায় না। লেখাটি পড়লেই মনে হয়, তিনি সুদূর লন্ডনে বসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কল্পকাহিনী রচনা করে চলেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এমন দক্ষ, চতুর মিথ্যাচার কেবল গাফ্ফার চৌধুরীকে দিয়ে সম্ভব–এ কথা আগে শুনে থাকলেও বিশ্বাস করিনি। এখন বিশ্বাস করি।"

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করানোর প্রশ্নে তৎকালীন স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদের টালবাহানা লীগ-চক্রান্তেরই অন্তর্গত বিষয় ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো '৭০ সালের নির্বাচনের পর হামলার প্রস্তুতির জন্য সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খাঁর অনুসৃত কৌশল অবলম্বন করা। পরে অবরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়ে প্রেসিডেন্টের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচন বাতিলের সুযোগ গ্রহণ করা অথবা সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসনের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করা। কিন্তু শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের দু'টি রাজনৈতিক এজেন্ডাই প্রেসিডেন্টের অস্বীকৃতি এবং গণ প্রত্যাখ্যানের কারণে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতা হারানোর জ্বালায় অস্থির শেখ হাসিনা জিঘাংসা নিবৃত্তির লক্ষ্যে পরবর্তীকালে আরো ভয়ংকর এক রণকৌশল নির্ধারণ করেন। নতুন করে তার দল সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে মাঠে নামে এবং সরকারকে একটি উগ্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে চিত্রিত করার প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে আওয়ামী ঘরানায় সবকটি প্রিন্ট ও দু'টি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক মিডিয়া। মিথ্যার বেড়াজালে তারা সত্যকে ঢাকার গোয়েবলসীয় অপপ্রচারে মেতে ওঠে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র এবং সরকার দু'টি পৃথক সত্তা। রাষ্ট্রের মালিকানা সমগ্র জনগণের, সরকারের নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কারা সরকার গঠন করবেন তা নির্ধারণ করে জনগণ। কোনো সরকারই একটা দেশের শেষ সরকার হয় না। জনগণের ইচ্ছায় সরকার বদল হয়। কাজেই এটা সহজবোধ্য যে, রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার অস্থায়ী। কিন্তু আওয়ামী লীগ কী ক্ষমতায়, কী বিরোধী দলে, রাষ্ট্র ও সরকারকে একাকার করে ফেলে। ক্ষমতায় থাকলে তারা রাষ্ট্রের মালিক মোক্তার বনে যায়। মনে করে দেশটা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারী আর জনগণ তাদের আশ্রিত প্রজাকুল। ক্ষমতায় থাকলে দল এবং সরকারের স্বার্থে রাষ্ট্র যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করে তারা, বিরোধী দলে থাকলে পরমতের প্রতি অশ্রদ্ধা-অসহিষ্ণুতা এবং সরকারের প্রতি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আচরণে এবং উচ্চারণে এমন সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যা শুধু সরকারকে নয়, রাষ্ট্রকেও বিপর্যস্ত করে। গণতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধিতা, সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন অন্যায় বা অবৈধ কাজ নয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হয়, সরকার বিরোধী আন্দোলন যেনো রাষ্ট্রঘাতী পর্যায়ে না পৌঁছে। আওয়ামী লীগ কখনো এই সার্বজনীন গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারার ধার ধারে না। একদিকে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমা লংঘন করে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের পথ অনুসরণ করে, অপরদিকে সরকারকে ঘায়েল করতে গিয়ে রাষ্ট্র তথা দেশ ও জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধনেও প্রবৃত্ত হয়।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে অপমানজনক পতনের পর লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল ও দলানুগত মহল এতোটাই প্রতিহিংসা-প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠেন যে, শ্বাপদের মতো ছোবল হানতে থাকেন যত্রতত্র। এ ছোবলের আঘাত গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের বেদীমূল পর্যন্ত। পরাজয়ের গ্লানি তাদের এতোটাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে যে, শুধু সরকার নয়, দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধেও তারা হিংস্র হায়েনার মতো থাবা বিস্তার করে। ক্রোধের বিষ তারা ঢালতে থাকে সমগ্র জাতির ওপর। দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি ভালোবাসা হয়ে যায় অপ্রধান। ক্ষমতাই তাদের কাছে প্রধান। দেশপ্রেমিকদের কাছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের চেয়ে দেশ বড়। দেশ

www.pathagar.com

থাকলেই রাজনীতি থাকবে, দল থাকবে, সরকারও থাকবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের আচরণ–উচ্চারণ থেকে প্রমাণ হয়, তাদের হাতে ক্ষমতার চেয়ে দেশ-রাষ্ট্র-গণতন্ত্র ততোটা মূল্যবান নয়। তারা ক্ষমতা না পেলে দেশের ক্ষতি হলেও যেনো তাদের কিছু যায় আসে না। ক্ষমতায় থাকাকালে দেশ ও গণস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্যই অষ্টম সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে। জনগণের সে রায়কে তারা মাথা পেতে নেয়নি। পেতে বসে ষড়যন্ত্রের জাল। ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে তারা সংসদ নির্বাচনকে বিতর্কিত করার মিথ্যাশ্রয়ী পথে অগ্রসর হয়।

দেশের ভোটার সাধারণ এবং আপামর জনতা দেখেছে কি সুন্দর, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যক বিদেশীকে আসার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এর ওপর ছিল বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী মিশনসমূহ, উন্নয়নসহযোগী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিদর্শকবৃন্দ এবং দেশীয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ টিম। নির্বাচন কমিশনতো বটেই, সকল দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষণ দল একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, অক্টোবর নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও নির্বাচনের দিন এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরদিন থেকেই তার চেহারা বদলে যায়। তিনি নির্বাচনে স্থূল কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যদিও জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। তবু পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং এ দেশের গণতন্ত্রের ওপর যারা ভবিষ্যতে গবেষণা ও ইতিহাস রচনা করবেন তাদের জন্য অষ্টম সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে দায়িত্বশীল মহল ও দেশী–বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য তুলে ধরছি।

প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ভোটগ্রহণকালে বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ হচ্ছে। এ পর্যন্ত কোথাও থেকে কোনো গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলার খবর পাইনি। ভোটাররা ব্যাপকভাবে ভোটকেন্দ্রে লাইন দিয়ে ভোট দিচ্ছেন। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার জন্য।' জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, 'সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এ নির্বাচনে কোনোরূপ কারচুপি হয়নি।' ভোটের দিন সন্ধ্যায় রংপুরে সাংবাদিকদের তিনি আরো বলেন, 'আমি খুবই আনন্দিত যে, দীর্ঘ ১০ বছর পর আমার নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছি।' ৩ অক্টোবর, ২০০১ সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ নির্বাচনের অভিমত নাকচ করে

www.pathagar.com

দিয়ে ১০ অক্টোবরের মধ্যে ফের ৩০০ আসনে ভোট দাবি করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই হুমকিও দেন যে, তা না হলে ১১ অক্টোবর থেকে তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে তিনি যে অভিযোগ উত্থাপন করেন সে ব্যাপারে আর কারো সমর্থন পাননি। একই দিন 'ডেমোক্রেসী ওয়াচ' তাদের নিবার্চন পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, "নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অল্প কিছু সংখ্যক কেন্দ্রে অনিয়ম ছাড়া প্রায় সকল কেন্দ্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ, বিডিআর-আনসার ও কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া প্রায় সকল কেন্দ্রের আশপাশে টহলরত সেনাবাহিনী মজুদ ছিল। সামগ্রিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ছিল সন্তোষজনক।" ডেমোক্রেসী ওয়াচ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশের ৩৯টি জেলার ১৭৭টি সংসদীয় আসনে প্রায় ৯৬৩৫ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। এই পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে ৫৮২ জন্য ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, ২০১ জন ভ্রাম্যমান সংসদীয় এলাকা সমন্বয়কারী সারা বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিসের প্রায় ১০০ জন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেন।'

ডেমোক্রেসী ওয়াচের পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যে টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম ও ঢাকার কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু অনিয়মের উল্লেখ করে বলা হয়, "এই অল্প কিছু সংখ্যক অনিয়ম ছাড়া ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বহুলাংশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এতো অল্প সংখ্যক অনিয়ম সমগ্র নির্বাচনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। ঢাকাসহ প্রায় সব জায়গাতেই ভোটারদেরকে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে দেখা যায়। ভোটার লাইনে মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ভোটদানের হারও ছিল সন্তোষজনক। দেশে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে সকল রাজনৈতিক দলকে পরম শান্তি বজায় রেখে এই ফলাফল মেনে নিয়ে উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে হবে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশের বিকাশমান গণতন্ত্রকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।" ৪ অক্টোবর ২০০১ দৈনিক দিনকালসহ অনেক দৈনিকেই এই পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ছাপা হয়।

আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের সমন্বয় কমিটি 'ইউনাইটেড নেশন্স ইলেক্টারাল এসিস্টেন্স সেক্রেটারিয়েট' ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছে, ভোট কেন্দ্রগুলো খোলা ও বন্ধ করা, ভোট গ্রহণ ও গণনা ভালো ছিল এবং নির্বাচন

www.pathagar.com

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিছু নির্বাচন কেন্দ্রের ভেতরে বাইরে কিছু কিছু ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ছাড়া অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা অবাধে ভোট প্রদান করেন। অনেক নির্বাচনী এলাকায় সহিংসতার আশংকা থাকলেও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ভোটারদের মাঝে নিরাপত্তাবোধ জোরদার করে। উল্লেখ্য, এনইওসির প্রায় তিন হাজার ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক দেশের সকল এলাকায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। মহিলাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'ও একই দিন জানায় যে, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ঢাকা মহানগরী, নোয়াখালী ও ফেনীতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটকেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। রাজশাহীভিত্তিক 'এসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট' বৃহত্তর রাজশাহীর ১৪টি ও জয়পুরহাট জেলায় তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে জানায় যে, বড় ধরনের কোন অঘটন ছাড়াই সুচারুরূপে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

'জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারিয়ান এসোসিয়েশন ইলেকশন অবজার্ভার' গ্রুপের প্রধান শিন সাকুরাইর নেতৃত্বে জাপানী নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল অষ্টম সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করে ৩ অক্টোবর। তারা বলেছেন, নির্বাচন স্বাধীন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও তরুণ ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণে প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। জাপানী পর্যবেক্ষক দলের নেতা বলেছেন, আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করছি, এবারের 'নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার যে প্রতিফলন ঘটেছে তাকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে যথাসত্বর সংসদে নতুন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই নির্বাচন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করবে'।

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী কূটনীতিকরাও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

২ অক্টোর বিএনপি'র বনানী কার্যালয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ ১৭টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের পক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি এ্যান পিটার্স, বৃটিশ হাই কমিশনার ডঃ ডেভিড কার্টার, কানাডিয়ান হাইকমিশনার ডেভিড প্রিস্টন,

www.pathagar.com

ইইউ এ্যাম্বেসেডর এন্টনিও ভি মেনেজেজ বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। কূটনীতিকবৃন্দ বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহের কথাও জানান। তারা জানান, দেশী –বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন সম্পর্কিত অভিমতের সঙ্গে তারাও একমত।

ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রও তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের অষ্টম সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশ করে। 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' বলেছে, 'খালেদা জিয়ার বিজয়ে রাজনীতিক হিসাবে তার নতুন করে পরিপক্বতার প্রতিফলন ঘটেছে।' হিন্দুস্তান টাইমস এ ফলাফলকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শক্তির পরাজয় হিসাবে বর্ণনা করেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলেছে, 'আওয়ামী লীগের এই অযাচিত পরাজয়ে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাসীন দলের প্রতি জন-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল। যা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অনুধাবন করেননি। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিজয়কে শেখ হাসিনা পুরোপুরি ভোট কারচুপি ও অন্যান্য ধরনের অনিয়ম হিসাবে বর্ণনা করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। হাসিনা ভুলে গেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ধারণাটি তার উদ্যোগেই সে দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে'। ১৯৯৬ সালে হাসিনার বিজয়ের তুলনায় খালেদা জিয়ার প্রত্যাবর্তনটি বিভিন্নভাবেই আরো দর্শনীয় হয়েছে। দৈনিক 'দ্য পাইওনিয়ার' বলেছে, 'বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জাগরণ আরো সংহত হয়েছে। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকা বলেছে, বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেছে, 'তারা ঢাকার নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত'। সরকারের নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়, বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সূত্র আরো উল্লেখ করে যে, নির্বাচনের ফলাফল ভারতের জন্য 'পরাজয়' বা পাকিস্তানের জন্য 'বিজয়' বলে যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করা নির্বাচনের ফলাফলকে দুঃখজনকভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার শামিল হবে। দ্য হিন্দুর রিপোর্টে আরো বলা হয়, নির্বাচনী প্রচারণায় সহিংসতা সত্ত্বেও এখানে এ নির্বাচন ঢাকায় আরেকবার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা জোরদারের

www.pathagar.com

নজির হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইসলামিক বিশ্বে গুটি কয়েক গণতান্ত্রিক দেশের অন্যতম হিসাবে সকলের কাছে নিজের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করেছে।

রির্পোটে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনীতির সাফল্যের ব্যাপারে ভারতের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। এতে বলা হয়, ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের প্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলাদেশ সরকার পরিবর্তনে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। পত্রিকায় আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রফতানি বাজার। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকি মোকাবিলায় ঢাকার সহযোগিতাও ভারতের জন্য অপরিহার্য। সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ করা, পরস্পরের দখলাধীন ছিটমহলগুলোর সমস্যা সমাধান এবং দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে ভারত আগ্রহী। ভারত এ ব্যাপারে ঢাকার নতুন সরকার সাড়া দেবে বলে আশা করে।

নির্বাচন সম্পর্কে উপরোল্লেখিত নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য, আলোচনার পর অষ্টম সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা এবং তার দলের স্থূল কারচুপির অভিযোগ হাস্যকর হলেও উদ্দেশ্যহীন নয়।

www.pathagar.com

আর কোন বিকল্প ছিলো না

শেষ পর্যন্ত সংসদে যাওয়াই স্থির করলেন শেখ হাসিনা। দ্বিতীয় চিন্তার কোনো পথও খোলা নেই তার সামনে। দুটি কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাদেরকে । এক. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, দুই, রাজনৈতিক বিপর্যয়। একাদিক্রমে সংসদের নব্বই কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে যে কোন সংসদ সদস্যের সদস্যপদ শূন্য হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্য শূন্য আসন বা আসনসমূহে উপ-নির্বাচনের নির্দেশ আছে সংবিধানে। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সাকুল্য ৫৮ সদস্যের কারো অনুপস্থিতিই ৭০ দিনের কম নয়। একজনের তো ৭৮ দিন। সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখলে আগামী বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিকেই তারা সদস্যপদ হারাবেন।

এ ব্যাপারে শাসকজোটের মনোভাবও এবার খুবই কঠোর। ৯১-৯৬ সালের মতো অতি উদারতার নীতি এবার তারা পরিহার করেছেন বলেই মনে হয়। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ এমপিদের আসন শূন্য হয়ে গেলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাতেই আওয়ামী লীগ নেতাদের পেটে মোচড় দিয়েছে। কারণ, তারা জানেন, তাতে আরো গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আওয়ামী লীগ। জনগণের ভোটের মর্যাদা রক্ষা না করলে আগামী নির্বাচনে জনগণ তাদের আরো উচিত শিক্ষা দেবে। তা ছাড়া যে সকল এমপি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, তা হারাতে চান না কেউ। তাদেরও প্রচণ্ড চাপ ছিল দলনেত্রীর ওপর।

তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে যে, দলের কেরিয়ার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে শেখ হাসিনার একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। তার কখনো নন-পলিটিক্যাল, কখনো এন্টি পলিটিক্যাল আচরণ- উচ্চারণের এরা ঘোর বিরোধী। অরাজনৈতিক ও অযোগ্য ব্যক্তিদের দলীয় উচ্চ পর্যায়ে পদায়নের ব্যাপারেও তাদের ক্ষোভ আছে। দলের ভাবমূর্তি বিনাশের জন্য এরা শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করেন। দলের ভেতর নানা বিষয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আমীর হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ সেলিম প্রমুখের নাম শোনা যায়। এদের চাপের কাছেও নত হয়েছেন শেখ হাসিনা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কারণটি অতি সাম্প্রতিক এবং তা দগদগে ঘা'র মতো গোটা আওয়ামী লীগকে দাহ করছে। লীগ প্রধান শেখ হাসিনার অনুমোদনে তার সেক্রেটারী আবদুল জলিল গত ৩০ এপ্রিল 'সরকার পতনের' ডেডলাইন ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমতাসীন সরকার, দল ও জোট ডেডলাইন ঘোষণাকে পাত্তা না দিলেও তাতে সাধারণের মধ্যে দেশব্যাপী একটা আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো। উৎপাদন, উন্নয়নও ব্যাহত হয়েছিলো 'ডেডলাইন' উপলক্ষে ডাকা হরতালসহ নানা কর্মসূচিতে। এই নিবন্ধে উল্লিখিত কয়েকজন নেতা ছাড়া শেখ হাসিনাসহ সারাদেশের লীগ নেতারা 'চোপার ও চাপার' জোরে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে জোট সরকারকে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিলেন! সর্বত্র লীগ নেতা-নেত্রী, কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিলো। শোনা গেছে, কোথাও কোথাও আবার নতুন করে 'মুজিব কোট' বানাবারও ধুম পড়েছিলো। শেখ হাসিনা এবং আবদুল জলিল একটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন। জলিল ২৯ এপ্রিলও বলেছেন, ট্রাম্পকার্ড এখনো ছাড়িনি, আর হাসিনা বলেছেন, সরকারের পতন আর সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। তারা এসব কথাবার্তা একেবারে কোনোপ্রকার প্রস্তুতি ছাড়া বলেননি। ২৫ এপ্রিলের পরই সরকারি গোয়েন্দারা জেনে যায় যে, কাজী ফারুকের 'প্রশিকা' নামক এনজিও'র সঙ্গে মিলে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হয়েছিলো। ঢাকায় লাখ লাখ লোক জড়ো করে একটা এনার্কী সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে দিশেহারা ও ভুল করতে উস্কানি দিয়ে কিছু লাশ জোগাড়ের পরিকল্পনা করেছিলো তারা। সরকারের ত্বরিত গৃহীত সঠিক সিদ্ধান্তে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যায় লীগ-প্রশিকা ষড়যন্ত্র। সকল লম্ফঝম্প ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় একদিকে তাদের নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়ে দারুণভাবে হতাশ, অপরদিকে তাদের সমর্থকরা নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারায়। হটকারিতা করতে গিয়ে গণবিচ্ছিন্ন শুধু নয়, গণরোষেও পতিত হয় আওয়ামী লীগ। শুধু ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন নয়, অস্তিত্বের সংকটে পড়ে দলটি। এমতাবস্থায় সংসদ সদস্যপদ টিকিয়ে রেখে রাজনৈতিক মর্যাদা এবং দলীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বার বার শেখ হাসিনা ও তার দলের প্রতি সংসদে এসে প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছেন। তাদের সকল সংসদীয় অধিকার সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন সংসদ নেত্রী। তাঁর আহবানে আরো আগেই সাড়া দিলে আওয়ামী লীগের মুখ আরো ভালোভাবে রক্ষা পেতো। এখন অনেক হারিয়ে সেই সিদ্ধান্ত নিতেই বাধ্য হলেন তারা। জনগণের আশা, লীগের এ সিদ্ধান্ত শুধু সংসদ সদস্যপদ রক্ষার জন্যই হবে না, সংসদকে আরো কার্যকর করার ব্যাপারেও তারা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন।

www.pathagar.com

সরকারের সাফল্যের কথা ওরা বলে না

একটি নির্বাচনী এলাকায় ৯/১০ মাসে কমপক্ষে বিশ কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড একেবারে কম নয়। এ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং হচ্ছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কারে। নির্বাচনী এলাকাটি জাতীয় সংসদ সদস্য বিচারপতি মোজাম্মেল হকের সিরাজগঞ্জ-৫ এলাকা। জাতীয় প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কিছু পত্র-পত্রিকার একচোখা ভূমিকা নিয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেন, পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পত্র-পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে হতাশ কণ্ঠে তিনি বলেন, কেউ কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা ও আতঙ্ক ছড়ানোর লক্ষ্যে নেতিবাচক সংবাদই শুধু পরিবেশন করছে, এসব রোধে সরকারকে ইতিবাচক কোনো পরামর্শ দিচ্ছে না। তিনি জানালেন, তার এলাকায় লীগ শাসনামলে মানুষের মনে শান্তি ছিল না, চোখে ঘুম ছিল না। উন্নয়নের কোনো উল্লেখযোগ্য ছোঁয়া লাগেনি শেখ হাসিনার পাঁচ বছরে। এখন এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং অনৈতিক কার্যকলাপ নেই বললেই চলে। চলছে নানামুখী উন্নয়ন তৎপরতা।

বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি এলাকায় দেড়শ টন গমের বরাদ্দ নিয়ে রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করেছেন, অনেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করেছেন, মক্তব, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ অথবা সংস্কার করেছেন। এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতে দশ কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার এলাকায়। এ ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে। সব মিলিয়ে প্রায় বিশ কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু এসব খবর পত্র-পত্রিকায় তেমন আসে না দিনকালসহ দু'একটি কাগজ ছাড়া। সংসদ সদস্য বিচারপতি মোজাম্মেল হকের এলাকাতেই শুধু নয়, সকল সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকাতেই এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে। কিন্তু কিছু পত্রিকা এবং দু'একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শুধু সন্ত্রাসেরই প্রচার চলছে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কোনো প্রচার নেই।

আমাদের দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সিংহভাগই আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে। নব্বইর গণঅভ্যুত্থানকালে বিশেষ করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর একানব্বই সাল

www.pathagar.com

থেকেই আওয়ামী লীগ মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তাতে সফলও হয়। বিএনপি বিরোধী বেশকিছু পত্রিকা ছাড়পত্র পায় বিএনপি শাসন আমলেই। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে তা ছিল বিএনপি সরকারের গণতান্ত্রিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তারা নিজেরা মিডিয়া ভুবনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে ওই সকল মিডিয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ গোয়েবলসীয় কায়দায় অবিরাম মিথ্যাচার করেছে, একটি মিথ্যাকে বারবার নানা পদ্ধতিতে প্রচার করে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে এবং জনমনে সরকার সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করতে পেরেছে। আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন এবং অগ্রগতির চাকাকে চুরানব্বই সাল থেকেই প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মিডিয়া আওয়ামী লীগের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল কার্যকলাপকে জাস্টিফাই করেছে এবং প্রচারের জোড়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। ৯৬-এ ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে বিএনপিকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতালাভের পেছনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তির চেয়ে মিডিয়া শক্তির অবদানই বেশি বলা চলে।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ কি করেছে? শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মানতে সকলকে বাধ্য করতে চেয়েছে, বিএনপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফিতা কেটে নিজেদের নাম বসিয়েছে, কোথাও কোথাও নাম বদল করেছে; ফেনীতে জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরে আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান, ঢাকায় হাজী মকবুল, হাজী সেলিম, কামাল মজুমদার, ডাক্তার ইকবাল, গফরগাঁও-এ গোলন্দাজ, বরিশালে হাসনাত আব্দুল্লাহ, আমীর হোসেন আমু, খুলনায় শেখ হেলালের মতো দেশের প্রায় সর্বত্র গডফাদার সৃষ্টি করে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজির বিভীষকা ছড়িয়েছে, হিন্দুদের মন্দির প্রতিমা ভাঙচুর করেছে, প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে তুলেছে; বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লুটেপুটে খেয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের সর্বনিম্ন ১১০ কোটি মার্কিন ডলারে ঠেকিয়ে গেছে। অপরদিকে বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর চালিয়েছে সীমাহীন নির্যাতন। একমাত্র বিএনপিরই দু'শতাধিক নেতা-কর্মীকে খুন করেছে তারা। জেলে পুরেছে দশ হাজারের বেশি। মামলা ঠুকেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ পর্যন্ত করতে দেয়নি। এতকিছুর পরও একমাত্র মিডিয়ার জোরে তারা ক্ষমতায় টিকে ছিল পাঁচ বছর।

পাঁচ বছরের বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব পেয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার। জোটের নির্বাচনী ওয়াদায় সন্ত্রাস দমনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। সে লক্ষ্যে সরকার কাজও করছে। শুধু রাজধানী শহরই বাংলাদেশ নয়।

www.pathagar.com

৮৬ হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার লীগ শাসনে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সমগ্র দেশে। জোট সরকার তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনেছে। গ্রামের মানুষ, বড় বড় তিন-চারটি নগরী ছাড়া অন্য সকল শহর বন্দরের মানুষও আগের তুলনায় শান্তিতে আছে। রাজধানী ঢাকাসহ প্রায় সর্বত্র চাঁদাবাজি, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন, ধর্ষণ অনেকটা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংস সন্ত্রাসী তৎপরতা এখনো রাজধানী এবং কয়েকটি নগরীতে রোধ করা যাচ্ছে না। এসব হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলোই পূর্ব পরিকল্পিত ও রাজনৈতিক। সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল করার দাবি সরকারও করে না। কিন্তু এটা তো সত্যি যে, বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের কোথাও কোনো গডফাদার তৈরি হয়নি, আওয়ামী লীগ সরকারের মতো বর্তমান সরকার সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের লালন করছে না। যেখানে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে, সেখানেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অপরাধীদের আইনের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। দলীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী পুত্র এবং এমপির ভাইকে পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এসব সৎ উদ্যোগ ও মহৎ কর্মের কোনো প্রশংসা অনেক পত্রিকাতেই দেখা যায় না।

দেশের অর্থিক খাতকে এক জরাজীর্ণ দশায় রেখে গিয়েছিলো লীগ সরকার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে রিজার্ভ এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। জাতীয় বাজেটে বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ যোগান বাড়ানো হয়েছে। রাজস্ব আয়ের টার্গেট ধরা হয়েছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। শেখ হাসিনার সরকারের সাবেক 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া তা নিয়ে উপহাস করেছিলেন। বলেছেন এটা সাইফুর রহমানের প্রতারণাশ্রয়ী উচ্চাভিলাষী টার্গেট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই টার্গেটও ছাড়িয়ে যাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তারা এতোটাই দেউলিয়া করে ফেলেছিল যে, ব্যাংক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন সরবরাহের সঙ্গতিও হারিয়ে ফেলেছিল। সে ক্ষেত্রেও এই এক বছরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিরোধী দলের সমর্থক মিডিয়ায় এর সামান্যতম স্বীকৃতিও নেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কলুষিত করে ফেলেছিলো। বেগম খাদেলা জিয়ার নির্দেশে এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে। কঠোর হস্তে নকল রোধ করা হচ্ছে এবং এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল অনেকটাই কমেছে। লীগ সরকার ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নকল লালন করেছে, নকলবাজদের প্রশ্রয় দিয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলে বই সরবরাহের ক্ষেত্রেও খালেদা জিয়ার সরকার বৈপ্লবিক সাফল্য দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ শাসনামলে কোনো বছরই ছাত্রছাত্রীরা সময়মতো বই পায়নি। জোট সরকারের প্রথম বছরের শুরুতেই এ চ্যালেঞ্জ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়; প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত তদারকিতে বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ইতোপূর্বে কোনো মন্ত্রীকে তা করতে দেখা যায়নি। নির্দিষ্ট সময়ে ছাপার কাজ যাতে সম্পন্ন হয়, সে জন্য তিনি দিন রাত অলিগলির প্রেসে প্রেসে পর্যন্ত ঘুরেছেন। অথচ শেখ হাসিনার আমলে বেক্সিমকোর বই কেলেঙ্কারির কথা দেশবাসীর জানা। এ বছরেও নির্দিষ্ট সময়ের আগে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছবে। জোট সরকারের এই সাফল্যের বিষয়টিও লীগ সমর্থক মিডিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। 'ছাত্রদের হাতে অস্ত্র নয়, বই দেখতে চাই' প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই কঠোর মনোভঙ্গিই শিক্ষাঙ্গনে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর সরকার অস্ত্রের রাজনীতি প্রশ্রয় দিচ্ছেন না, তাঁর দলীয় ছাত্র সংগঠনকে সেভাবেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নাসির উদ্দিন পিন্টুকে ছাত্রদলের সভাপতি করায় অনেক পত্রিকা কঠোর সমালোচনা করেছে, বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালে সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠকে কোনো কোনো সম্পাদক বিষয়টি চিহ্নিত করে অনেক নিষ্ঠুর মন্তব্য পর্যন্ত করেছেন। (যদিও তারা অন্য কোনো দলের ছাত্রসংগঠন সংক্রান্ত এমন ভূমিকার সমালোচনা কখনো করেননি) কিন্তু পিন্টুকে বাদ দিয়ে নুতনভাবে ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদল গড়ার উদ্যোগের কোনো প্রশংসা এরা করছে না। এদের আচরণে মনে হয়, আধিপত্যবাদী শক্তির সেবাদাস হওয়া এবং তাদের স্বার্থের পাহারাদার হওয়াই তাদের ললাটের লিখন। সে অক্টোপাস ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না, চাইছেও না।

www.pathagar.com

'সাতশ ইঁদুর মেরে' শেখ হাসিনা এখন 'বিড়াল তপস্বী'

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা ভাষণে যে পারঙ্গম ২ অক্টোবর তিনি আবারো তার প্রমাণ দিলেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের সাংবাদিক কনভেনশনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে যেভাবে এবং যেহারে সাংবাদিক নির্যাতন হচ্ছে কস্মিনকালে তিনি তা দেখেননি। তিনি আরো বলেছেন, তাদের ক্ষমতাকালে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের ওপর তারা কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করেননি। তাদের আগে যারা ক্ষমতায় ছিল এবং এখন যারা ক্ষমতায় আছে, তারা অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাস করে না। দুর্নীতি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খবর লিখলে সাংবাদিকরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। একেবারে সুফি-সাধকের মতো কথা! 'সাতশ' ইঁদুর মেরে' তিনি এখন 'বিড়াল তপস্বী' সেজেছেন।

সংবাদপত্রসেবীরা সেদিন তার কথায় হেসেছেন। শেখ হাসিনার রাজত্বকাল শেষ হয়েছে মাত্র এক বছরের কিছু সময় আগে। সে সময় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে লীগ সরকার এবং শাসক দলের দুর্বৃত্তরা কি দুঃসহ আচরণ করেছে, এত তাড়াতাড়ি তা দেশবাসীর বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। শুধু শেখ হাসিনা নন, তার বাবার রাজত্বকালেও সাংবাদিকদের দুঃসহ জীবন-যাপন করতে হয়েছেন, সাংবাদিকরা সত্য প্রকাশের অপরাধে সেই আমলেও খুন হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছেন। পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অবাধ তথ্য প্রবাহে অনীহার কারণে শেখ মুজিব তার ভাগ্নে শেখ ফজুলুল হক মনির পত্রিকাসহ মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখে বাদবাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে দেন। শ' শ' সাংবাদিক কর্মচারীকে পথে বসিয়ে দেন। যেদিন এ শেখ মুজিব সম্পন্ন করেছিলেন৭৫-এর সেই ১৬ জুনকে এদেশের সাংবাদিকরা এখনো 'কালো দিবস' হিসাবে পালন করে।

শেখ হাসিনার ৫ বছরে দেশে কমপক্ষে ১০ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। তার মধ্যে শুধু দেশের দক্ষিণাঞ্চলেই খুন হন ৭ জন। নিহতরা হলো সাতক্ষীরার 'দৈনিক পত্রদূত' সম্পাদক স,ম আলাউদ্দিন, চুয়াডাঙ্গার 'দিনবদলের কাগজ' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার বজলুর রহমান, ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী রেজাউল করিম রেজা, যশোরের 'দৈনিক রানার' পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল, ঝিনাইদহের সাংবাদিক মীর ইলিয়াস, যশোরের দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ

www.pathagar.com

সংবাদদাতা শামছুর রহমান ও খুলনার 'অনির্বাণ' পত্রিকার সংবাদদাতা নহর আলী। একই সময়ে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী ও পুলিশ বিডিআর-এর হাতে নির্যাতিত হন ৩ শতাধিক সাংবাদিক। আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে সন্ত্রাসীরা ইউএনবির ফেনী সংবাদদাতা টিপু সুলতানকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে পঙ্গু করে দেয়। নৃশংসতার ইতিহাসে তা ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা। লীগ সরকারের একজন মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় পেশাদার সন্ত্রাসী লেলিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দৈনিক জনকণ্ঠের ফরিদপুর সংবাদদাতা প্রবীর শিকদারকে। তার ডান পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের ঘটনাও কম নয়। দেখা গেছে, বিরোধী দলের আহূত হরতালের সময় বা অন্য কোনো কর্মসূচিতে পুলিশী এ্যাকশনের ছবি তুলতে গেলেই ফটো সাংবাদিকদের ওপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। হাসিনা আমলে যে সকল ফটো সাংবাদিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে গুরুতর জখম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে জনকণ্ঠের সানাউল হক, ডেইলী স্টারের ইমরান ও আনিস, বাংলার বাণীর স্বপন সরকার, বাংলাবাজার পত্রিকার জয় ও জনতার মিন্টু, ইনডিপেন্ডেন্টের বুলবুল, দিনকালের খালেদ হায়দার ও বাবুল তালুকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী গডফাদার শামীম ওসমানের বাহিনীর হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নির্যাতনের ওপর একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর ২০০০ সালের ৮ মার্চ পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা দৈনিক দিনকাল অফিস আক্রমণ করে, সাংবাদিকদের মারধর করে এবং অফিস তছনছ করে দেয়। আওয়ামী দুরাচারের বিরুদ্ধে লেখার অপরাধে সাংবাদিকদের হাত-পা গুড়িয়ে দেয়ার প্রকাশ্য হুমকি দেয় আওয়ামী মন্ত্রী-নেতারা। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের হত্যা, সন্ত্রাস, জুলুম, নির্যাতন চালিয়ে তিনি এখন সাধু সাজতে চাইছেন।

www.pathagar.com

সুরঞ্জিত বাবু সেনাবাহিনীর কাছে নির্বাচন দাবি করলেন কেন?

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেনাবাহিনীর কাছে নির্বাচন দাবি করেছেন। ১৯ অক্টোবর পল্টনে লীগের জনসভায় তিনি যা বলেছেন এবং ২০ অক্টোবর ইত্তেফাক, ইনকিলাব ও দিনকালসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে যা ছাপা হয়েছে, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। ইত্তেফাক এবং ইনকিলাব সুরঞ্জিতকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, সেনাবাহিনী যদি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করে, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে, তাহলে এ সরকারের কাজ কি? সেনাবাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজেদের তালিকা অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন। অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। দৈনিক দিনকালেও একই ধরনের রিপোর্ট ছাপা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে দুর্নীতি সম্পর্কিত তার 'দৈব-বাণী'।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সুরঞ্জিত সেনের এই বক্তব্য উসকানিমূলক এবং দেশে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা নস্যাতের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলকও বটে। দেশে বর্তমানে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন। সুরঞ্জিত বাবু শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের সাংবিধানিক নিয়ম-পদ্ধতি তার না জানার কথা নয়। সংবিধান অনুযায়ী একটি নির্বাচিত সরকার মেয়াদ শেষে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। প্রচলিত এবং সকল দলমতের লোক কর্তৃক স্বীকৃত এ ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, লীগ নেতা সুরঞ্জিত বাবু সব কিছু জেনেশুনে—তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি নিজেও লীগ প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—কেন সেনাবাহিনীর প্রতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য আহবান জানালেন?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, সুরঞ্জিত সেন দেশকে অসাংবিধানিক এক অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ওই বক্তব্য রেখেছেন। ২০০১

www.pathagar.com

সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকেই লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আবার ক্ষমতার জন্য উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতা হারানোর জ্বালায় তারা এতোই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিও তাদের লোপ পেয়েছে। কতোটুকু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলে তারা একটি সংবিধানসম্মত ও দেশী-বিদেশী হাজার কয়েক পরিদর্শক কর্তৃক প্রশংসিত একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানাতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। তারা অষ্টম সংসদ নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন দেয়ার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ওদের স্বার্থহানি ঘটলে, লাভ না হলে প্রথা, আইন ও সংবিধান অগ্রাহ্য করাই তাদের ঐতিহ্য।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেনাবাহিনীকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহবান জানিয়ে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। এ জন্য অবশ্যই তাকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি নির্বাচিত সরকারের কাছে আগাম নির্বাচন দাবি করতে পারেন, সেনাবাহিনীর কাছে নয়। তবে হ্যাঁ, সেনাবাহিনীর কাছে তখনই নির্বাচন দাবি করা যায়, যখন সেনাবাহিনী দেশ চালায়, ক্ষমতায় থাকে। একমাত্র সামরিক শাসনামলেই ইউনিফর্ম পরে সেনাবাহিনী দেশ চালায়। সুরঞ্জিত বাবু কি তাহলে সেনাবাহিনীর কাছে দেশে মার্শাল ল' প্রার্থনা করলেন? নিজের নাক কেটে হলেও অপরের যাত্রা ভঙ্গের জন্য এতোটুকু নিচে নেমে গেলেন সুরঞ্জিত বাবুরা?

শেখ হাসিনা-সুরঞ্জিত বাবুরা অবশ্য তা পারেন। তারা নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার স্বার্থে সব দল নিষিদ্ধ করে এক নেতার একদল বাকশালী ফ্যাসিবাদ যেমন কায়েম করতে পারেন, তেমনি অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের পথ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে মার্শাল ল'কে স্বাগতও জানাতে পারেন। ১৯৮২ সালে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচিত বৈধ সাংবিধানিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তারা সামরিক একনায়ক এরশাদের সহযোগী ছিলেন, এরশাদের সামরিক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার ভাই শেখ সেলিমের বাংলার বাণীতে এরশাদের মার্শাল ল' জারির পর 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' শিরোনামে বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সামরিক আইন জারিতে আমি অখুশি নই। স্বীয় স্বার্থে অসাংবিধানিক কাজে তারা পারঙ্গম। বেগম খালেদা জিয়ার বিগত সরকারের আমলে এই আওয়ামী লীগই সংবিধান বিরোধী আমলা বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। ক্ষমতাচ্যুক্তির জ্বালা মেটানোর উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়ার

www.pathagar.com

নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আওয়ামী লীগ নতুন মাত্রা যোগ করতে চাইছে বলে মনে হয়। আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সুনাম ও গৌরবকেও তারা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌথ অভিযানে সেনাবাহিনী অংশ নিচ্ছে। জাতীয় জরুরি প্রয়োজনে এভাবে সেনা মোতায়েন আমাদের সংবিধানসিদ্ধ। সেনাবাহিনী একক সিদ্ধান্তে এ অভিযানে নামেনি। আওয়ামী লীগ আগুন নিয়ে খেলতে চাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। তারা এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চাচ্ছে। একদিকে বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে উস্কে দিতে চাচ্ছে, অপরদিকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়া অভিযান চালিয়ে জাতির আশা ও গর্বের সে প্রতিষ্ঠানটিও ধ্বংস করতে চাইছে। এ ব্যাপারে জনগণের নির্বাচিত সরকার ও সেনাবাহিনী—উভয়কেই সতর্ক থাকতে হবে। দেশ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও সন্ত্রাস দমনের মতো একটি মহৎ কাজে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ধন্য একটি অভিযান যেন কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রের গ্যারাকলে আটকা না পড়ে এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র বিনাশী আধিপত্যবাদের তাঁবেদার শক্তির কোনো নীলনকশা যাতে কার্যকর হতে না পারে সেদিকে সরকার, দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে জনগণকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

দ্রুত বিচার আইনের বিরোধিতা কেন?

আওয়ামী লীগ দ্রুত বিচার আইনের বিরোধিতা করছে। তারা বলছে, এ নাকি মানবাধিকার বিরোধী কালাকানুন। এটা সকলের জানা যে, ৬টি বিশেষ অপরাধের ত্বরিত বিচারের লক্ষ্যে সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং গত ২৪ অক্টোবর এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশও জারি হয়েছে। দিনকাল বলেছে আজ কালের মধ্যে এবং কোনো কোন পত্রিকা বলেছে এ সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন হবে। দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ এতে আনন্দিত হলেও লীগ নেতারা কেন তা চান না বোঝা তেমন কঠিন নয়। তাদের হয়তো ভয় যে, এতে লীগের লোকরাই বেশি ফাঁসবে এবং তারা ফাঁসলে দেশে হত্যা আর সন্ত্রাসের পেছনে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সৃষ্ট গড ফাদাররাই যে কলকাঠি নাড়ে তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদকদ্রব্য এবং মজুদদারী সংক্রান্ত অপরাধের বিচার হবে ট্রাইব্যুনালে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে না পারলে বিচারক, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও শাস্তির বিধান আছে জারিকৃত অধ্যাদেশে। প্রথম দফা ৯০ দিন, দ্বিতীয় দফা ৩০ দিন এবং সর্বশেষ আরো ১৫ দিন অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১৩৫ দিনের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত মামলার বিচার সম্পন্ন করতে হবে। এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমরা মনে করি, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে অপরাধীদের স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচার এবং শাস্তি হয়ে গেলে দেশে শুধু ৬ ধরনের অপরাধই নয়, সব ধরনের অপরাধই কমে যাবে, নতুন অপরাধীর সৃষ্টি হবে না। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ ফিরে আসবে। এর যারা বিরোধিতা করছে বা করবে তারা সমাজে অশান্ত, অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। রাজনৈতিক কোনো দল বা শক্তি অথবা ব্যক্তি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাওয়া বা প্রার্থনা করার অর্থ তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়।

এ ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত নেই যে, আমাদের দেশে বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ায় অপরাধীর শাস্তি বিধানও দীর্ঘায়িত হয়। এতে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে পরিমাণ আস্থা থাকা দরকার আমাদের দেশে তার ঘাটতি আছে। দেশে নানা ধরনের অপরাধের ক্রমবর্ধমান হার শান্তিপূর্ণ নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। উৎপাদন, উন্নয়ন এবং জাতীয় সমৃদ্ধি এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। আমাদের আশপাশের

www.pathagar.com

দেশসহ সারা পৃথিবী যে হারে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। অথচ, মুক্তবাজার অর্থনীতির কঠিন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে না পারলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। এ অবস্থায় সমৃদ্ধির আলোকিত পথে এগিয়ে যেতে হলে অন্ধকার ঘুচাতেই হবে।

একটি জাতিকে সমৃদ্ধির প্রভায় আলোকিত করতে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উপযোগী, সাহসী এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। নানাপ্রকার দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দুর্নীতি আমাদের অগ্রসরতার পথে বাধা। সব বাধা এক সঙ্গে দূর করা যাবে না। একটি জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় স্থিতি অপরিহার্য শর্ত। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সর্বদাই সন্ত্রাস, নৈরাজ্য দমন করে সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় স্থিতির পক্ষে কথা বলেছেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে হয়তো আন্তরিকও ছিলেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে যারা আমাদের জাতীয় অগ্রসরতায় বাধা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা এবং নানা দুর্বলতার কারণে দুর্বৃত্ত, খুনী, সন্ত্রাসীরা দিনে দিনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না বলে অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যাও বাড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে জোট সরকারের দ্রুত বিচার আইন অধ্যাদেশ এবং দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত একটি বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি। দেশে আইনী দুর্বলতার কারণে সাম্প্রতিককালে নানা ধরনের অপরাধ অস্বাভাকিভাবে বেড়েছে। দেশ এবং জাতি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়। কিন্তু প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয় বলেই সরকার ছয়টি বিশেষ অপরাধ চিহ্নিত করে এসবের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা দেশের প্রবীণ আইনজীবী খোন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে একমত যে, দ্রুত বিচার ব্যবস্থাটা বেগম জিয়ার সরকারের আমলে গ্রহণ করা হলেও সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করে নেয়া হয়েছে বলে ধারণা সঠিক নয়। অপরাধীদের ত্বরিত বিচারের প্রয়োজনীয়তা সমাজের সকল স্তরের মানুষ দীর্ঘদিনই অনুভব করছিলেন। কিন্তু খালেদা জিয়ার আগে কেউ সিদ্ধান্তটি নেননি। এ সিদ্ধান্তে দেশবাসী আনন্দিত। তারা প্রাণভরে প্রধানমন্ত্রীকে দোয়া করছেন।

আওয়ামী লীগ বক্তৃতায় গণতন্ত্র এবং শান্তির কথা বলে। যে সকল অপরাধ গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করছে, মানুষের জান-মাল-ইজ্জত বিপন্ন করছে, শান্তিবিনাশ করে জাতীয় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করছে, এসব রোধকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা

www.pathagar.com

তাদের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা ক্ষমতার লিপ্সায় সরকারকে বিব্রত এবং অস্থিতিশীল করার হীন দলীয় স্বার্থে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন রোধ হোক তা চায় না। পতিত লীগ সরকারের সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু দ্রুত বিচার আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তুলেছেন। কিছু খুনী, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত যে দেশের প্রায়-চৌদ্দকোটি মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সে বিষয় তিনি বিবেচনা করেননি। আইনে বলাই হয়েছে যে, উল্লিখিত ছয়টি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদেরই বিচার ও শাস্তি হবে। এতে সাবেক আইনমন্ত্রীর এতো উষ্মা কেন? তিনি কেন খুনী-সন্ত্রাসীদের মানবাধিকার নিয়ে এতো পেরেশান তার বক্তব্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে তা আওয়ামী লীগের বিপক্ষেই যাবে। ক্ষমতায় থাকাকালে সন্ত্রাসকে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন করেছেন। তাদের আমলে কোন অপরাধ ও প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি তো দূরের কথা বিচার পর্যন্ত হয়নি। এখন অপরাধী সরকারি দলের হলেও তার বিচার হচ্ছে, শাস্তি হচ্ছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, অষ্টম সংসদ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর সরকারকে অস্থিতিশীল করে তার জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তারা সন্ত্রাস-নৈরাজ্য আরো উস্‌কে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। আওয়ামী লীগের রাজনীতি জনগণ-নির্ভর নয়, মূলত সন্ত্রাস-নির্ভর। তার প্রমাণ তারা রেখে গেছে ক্ষমতা হারানোর কিছুদিন আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে ভুয়া ঠিকানায়, বেনামে কয়েক হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স বিতরণের মধ্য দিয়ে। দ্রুত বিচার আইনে এ সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ফেঁসে গেলে তাদের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস-নির্ভর রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে সেজন্যই কি তারা এর বিরোধিতা করছেন? এ আইনে জোট সরকারভুক্ত বিভিন্ন দলের লোকও তো পাকড়াও ও বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তো এতে শঙ্কিত নন। সন্ত্রাস দমন করতে হলে দেশের স্বার্থে দলের ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে।

www.pathagar.com

জোট সরকারের এক বছর

জোট সরকারের বর্ষপূর্তি আজ। গত বছর ১০ অক্টোবর রাতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এ সরকার শপথ নিয়েছিলো। পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত একটা সরকারের জন্য এক বছর খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু সরকারকে ভাবতে হবে উল্টো—পাঁচ বছরের মধ্যে এক বছর কিন্তু চলে গেছে। একটি সরকারের সাফল্য ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ এখনই করা না গেলেও তারা কি করতে চায়, কি করবে সে সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য এক বছর সময়ই যথেষ্ট। সরকারের সক্ষমতা অক্ষমতাও এরই মধ্যে প্রকাশ পায়।

একটা লণ্ডভণ্ড অবস্থায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা ছিলো না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ধ্বংসযজ্ঞ সামাল দিয়ে জনগণের আশা ও স্বপ্ন পূরণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই ক্ষমতা নিয়েছে জোট সরকার। ভোটের আগে তারা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উন্নত,সমৃদ্ধ ও শান্তিময় এক বাংলাদেশ উপহার দেবেন। অতীত বিবেচনায় জনগণ তাদের বিশ্বাস করেছে এবং অকল্পনীয় বিজয় উপহার দিয়েছে। এখন বললে চলবে না যে, আমরা আওয়ামী লীগের জন্য কাজ করতে পারছি না বা ওয়াদা রক্ষা করতে পারছি না। এক বছর সময়ে সরকার কি করেছে, কতটুকু করতে পেরেছে তা থেকে সরকারের আগামী চার বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ না হলে জনগণই সরকারের শেকড় ধরে টান দেবে।

আমরা মনে করি, জোট সরকারের গত এক বছরের পারফরমেনস হতাশাজনক নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রেরণাদায়ক। অর্থনৈতিক সেক্টরের কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে একথা সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে হাসিনা সরকার এর জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিলো। কি সরকারি, কি বেসরকারি-কোনো ব্যাংকেই ন্যূনতম কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। আওয়ামী লীগের চিরায়ত লুণ্ঠন-সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব এই খাতের চেহারা বিবর্ণ করে ফেলেছিলো। লীগ মাস্তানদের প্রতাপে ব্যাংকের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত ছিলো। স্বনামে-বেনামে চলেছে লুটপাট। একবারও ভাবেনি যে, কোনো নেতা, মন্ত্রী বা সিবিএ নেতার প্রভাব খাটিয়ে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে যে টাকা-পয়সা লোপাট করা হচ্ছে তা কারো বাবার টাকা নয়, জনগণের টাকা। একদিকে দলীয় লুণ্ঠন

www.pathagar.com

অপরদিকে সরকারের সীমাহীন ঋণ গ্রহণের ফলে লীগ আমলে সিডিউল ব্যাংকে তারল্য সংকট প্রায় স্থায়ী রূপ নিয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিলো যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন যোগান দেয়ার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছিলো। এক বছর সময়ের মধ্যেই সে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সিবিএর উপদ্রব নেই, নেতাদের বাড়াবাড়ি থেমেছে, গায়েবী নামে ঋণ বিতরণ বন্ধ হয়েছে। ব্যাংকিং সেবার মান উন্নত হয়েছে, আওয়ামী লীগ সৃষ্ট ফোকলা অবস্থা থেকে ব্যাংকসমূহ এখন হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানীতে এনে ঠেকিয়েছিল লীগ সরকার। ১১০ কোটি মার্কিন ডলারের সেই আশঙ্কাজনক রিজার্ভ মাত্র এক বছর সময়ে প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছে জোট সরকার। এ এক বিরাট অর্জন তাদের।

শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবেশ, বিচার ব্যবস্থাসহ অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। লীগ সরকার কখনোই ছেলে-মেয়েদের হাতে সময়মত বই তুলে দিতে পারেনি। তাদের শেষ বছরে বেক্সিমকোর সঙ্গে মিলে হাসিনা সরকার যে বই কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়েছিল, এ ধরনের ঘটনা আর কোথাও কখনো দেখা যায় না। বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম তিন মাসেই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই সরবরাহ করেছে। পরীক্ষায় নকল রোধে তারা সাহসী ভূমিকা রেখেছে এবং প্রথম বছরেই এ ব্যাপারে বেশ ভালো সাড়া মিলেছে। কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি কমেছে, শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠছে। ছাত্র রাজনীতি পরিশীলিতকরণ প্রক্রিয়াও সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিগত সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে চরদখলের মতো দখলাভিযান-কালিমা চালিয়েছিলো বর্তমান সরকার সে পথে পা দেয়নি। বরং শিক্ষাঙ্গনের সকল কলুষ দূর করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী সকল রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয় ভাবতে বলেছিলেন। কিন্তু কেউ তা ভাবেনি, বরং উল্টো ব্যাখ্যা হয়েছে একটি সদিচ্ছার।

পরিবেশ উন্নয়নেও সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পলিথিন উৎপাদন এবং এর যথেচ্ছ ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের পরিবেশ দূষিত করছিলো। সরকার প্রথমেই এই পলিথিন নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তা কার্যকর করে। পুরনো যানবাহন ও টু স্ট্রোক থ্রি হুইলার গাড়ি চলাচল বন্ধ করে। এতে রাজধানীর পরিবেশ অনেকটা উন্নত হয়েছে। ঢাকার রাজপথে চলতে এখন আর চোখ জ্বালা-পোড়া করে না। আশা করা যায়, শিশু-কিশোরসহ সকল নাগরিক পরিবেশের এই উন্নয়নের ফলে

www.pathagar.com

নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাবে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক বছরে কাজ কম হয়নি। অনেক সেতু-কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে, সড়কপথে যাত্রা সহজ ও নিরাপদ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। একমাত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যতিরেকে সকল ক্ষেত্রেই এই এক বছরে জোট সরকার সাফল্য দাবি করতে পারে। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারেও সরকারের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। শেখ হাসিনার শাসনামলের মতো এখন এলাকায় এলাকায় গডফাদার সৃষ্টি হচ্ছে না, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলে রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস কোথাও লক্ষ করা যায় না। হত্যা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। এটা খুবই আশার কথা যে, কোথাও কোনো সন্ত্রাসীকে ছাড় দেয়া হচ্ছে না। খুনী, সন্ত্রাসীদের লীগ শাসনামলের মতো আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিয়ে তাৎক্ষণিক আইনের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে, বিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা এক বছরের কার্যক্রমে সরকারের একটি ভালো দিক।

নির্বাচনকালে জনগণের কাছে দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি এক বছরেই পূরণ করা কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সরকারকে সকল কাজে স্বচ্ছতার ছাপ রাখতে হবে। জনগণকে বুঝতে দিতে হবে যে, সরকার নিজের দল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য নয়, জনগণের জন্য কাজ করছে। তাহলে কেউ ভুল বুঝিয়ে জনগণকে বিপথে পরিচালিত করতে পারবে না। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ ছোট দেশ, অগ্রসর মানুষেরা অনেক কিছুই জানেন, বোঝেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কোনো দুরাচারী, অসৎ, অর্থলোলুপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দেয়া হলে তা সরকারের দেহে ক্যান্সার ছড়ায়। খোলা চোখেই ওই মানুষেরা তা দেখতে পায়। আমরা আশা করবো, জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর চোখেও তা ধরা পড়বে এবং আগামী চার বছরে কারো কারণে তার দেশপ্রেম, সততা, শ্রম এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় যাতে কোনো দাগ না পড়ে সেদিকে তিনি সদা-সতর্ক থাকবেন। আমরা আশা করি, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার এক বছরের অর্জনকে সংহত করে দেশ ও জাতিকে অধিকতর উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

সেনা অভিযানে স্বস্তি জনমনে

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমন করে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে অবশেষে সরকারকে সেনা তলব করতে হয়েছে। ১৭ অক্টোবরের সূর্য ওঠার অনেক আগেই সেনা সদস্যরা দেশের সন্ত্রাস-কবলিত বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেয় এবং কোথাও কোথাও পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিযান শুরু করে। দু'দিন সমাজের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের যে মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সেনা অভিযানে তারা সন্তুষ্ট, বেজায় খুশি। শেখ হাসিনা এবং তার দলের মতামত পাওয়া গেছে গতকালের সংবাদপত্রে। তিনি এতে দেশ পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা আবিষ্কার করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এটা স্রেফ একটা রাজনৈতিক আক্রমণ। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সেনা তলব করতে পারে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এই মুহূর্তে জরুরি রাষ্ট্রীয়-চাহিদা। এই জরুরি কাজে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতার জন্য সেনাতলব করা হয়েছে। সরকার তো তার সাহায্যের জন্য বিদেশী কোনো বাহিনী তলব করেনি। দেশের একটি কষ্টসাধ্য কাজে দেশেরই একটি সৎ, সুশৃঙ্খল, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সাহসী শক্তিকে ডাকা হয়েছে। সেনাবাহিনী সরকারের বাইরের নাকি? দুর্বৃত্ত দমন এবং দুর্বৃত্তায়ন রোধে সেনাবাহিনী ডাকায় সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ হলো কি করে? বরং জনগণের জান-মালের হেফাজত, সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় স্থিতির জন্য এতে সরকারের আন্তরিকতাই প্রকাশ পেয়েছে।

কারো ভালো বা মহৎ কর্মের স্বীকৃতি ও প্রশংসা আওয়ামী লীগের অভিধানে নেই। আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের যে কোনো ভালো কাজেরও বিরোধিতা ও সমালোচনা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক বিষয় হচ্ছে এর বাইরেও কারো কারো এ ব্যাপারে ক্ষোভ ও অভিমান। ঢাকায় গ্রেফতারকৃত কমিশনারদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন এবং কয়েকজন কমিশনার ও তাদের কিছু সমর্থক ১৭ অক্টোবর রাতে সেনা অভিযানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। কেউ নাকি নাখোশ হয়েছেন তাদের অজ্ঞাতে এ অভিযান শুরুর কারণে। প্রথম দিন গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সিংহভাগই শাসকজোটের প্রধান শরীকদল বিএনপির নেতা-কর্মী। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

আমলের শেষ দিকে বিএনপি দলন ও দমনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা বানোয়াট সন্ত্রাসী তালিকা অনুযায়ী অভিযান চলছে, পুলিশ সেই তালিকাই সরবরাহ করেছে। হাস্যকর অভিযোগ! জোট সরকার এক বছর দেশ শাসন করছে। এই সরকারের নির্বাচনীয় ওয়াদার মধ্যে সন্ত্রাস দমন অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি। সরকারের ভেতর যারা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা কি এক বছর সচিবালয়ে বা অন্য কোন সরকারি দফতরে বসে বসে ললিপপ চুষছিলেন? তারা প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে তালিকা প্রস্তুত করলেন না কেন? আগের লিস্ট অনুযায়ী ধরপাকড় হচ্ছে বললে ওপরের বক্তব্যটা জোরালোভাবেই এসে যাবে। বক্তব্যের ধরন ভিন্ন হলেও সেনা অভিযানের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কিছু লোকের ভেতর আশ্চর্য একটা মিল লক্ষ্য করা গেলো।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সঠিক কাজটিই করেছেন। সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে তিনি জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ-এটা তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা। সন্ত্রাস দমন করতে হলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুর্বৃত্ত-অস্ত্রধারী এমনকি লীগ আমলের লাইসেন্সধারী অস্ত্রবাজদেরও পাকড়াও করতে হবে। এর প্রাথমিক দায়িত্ব দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর। নিষ্ঠুর হলেও সত্য যে, আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী জনগণের আস্থা, ভালোবাসা ধরে রাখতে পারছে না। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন বিপদে-আপদে, দুর্যোগে, দুর্বিপাকে পুলিশকে মনে করা হয় পরম বন্ধু, বিশ্বাস আর নির্ভরতার স্থল, আমাদের দেশে সে অবস্থা নেই। বলা হয়ে থাকে, এক বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য পুলিশের কাছে গেলে আমাদের দেশে নতুন নতুন বিপদে পড়ে মানুষ। এক বছরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ তেমন কোন সাফল্য দেখাতে পারেনি। বরং এ সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ আছে তা পুলিশের পক্ষে যায় না। আওয়ামী লীগ আমলে পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশের ভেতর লীগের কিছু দলবাজ লোকও আছে বলে অভিযোগ আছে। এরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপারে ভেতর থেকে স্যাবোটাজ করেছে বলে মনে হয়। তাই এক বছরে পুলিশকে দিয়ে কাজের কাজ তেমন কিছু হয়নি। তাই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা ছাড়া সরকারের সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিলো না।

জোট সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে না পারার কথা স্বীকার করে জাতির কাছে এ জন্য আর কিছু সময় চেয়েছেন। তখনই ধারণা করা গিয়েছিলো যে, তিনি এ জন্য জাতির কাছে দ্বিতীয়বার সময় চাইবেন না; কাজেই শিগগিরই একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নেবেন। বেগম খালেদা জিয়াকে যারা বোঝেন,

www.pathagar.com

তারা একমত হবেন যে, মহৎ কোন জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাতে পরের লোক কি ঘরের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তা তিনি ভাবেন না। জাতীয় স্বার্থে সৎ উদ্দেশ্যটাই তাঁর কাছে প্রধান। কাজেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর অভিযানে দলীয় কিছু লোকও যদি আটকে যায় তাতে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বদল হবে বলে মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সেনা অভিযানে নিয়োজিত সৈনিক অফিসারদের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই, টপটেররদের যদি আপনারাও ধরতে না পারেন বা না ধরেন, ঠিকানাবিহীন লোকজনের নামে লীগ সরকার যে সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দিয়ে গেছে (যে সব এখন অবৈধ অস্ত্রে পরিণত হয়েছে) তা উদ্ধারে যদি ব্যর্থ হন, জনগণের চেনা জানা প্রকৃত ক্রিমিনালদের যদি আপনারাও স্পর্শ না করেন, তা হলে আপনারাও মানুষের আস্থা, ভালোবাসা হারাবেন। আমরা আশা ও বিশ্বাস করতে চাই যে, সেনাবাহিনী তাদের সুনাম এবারও অক্ষুণ্ন রাখবে। শেখ হাসিনার উদ্দেশে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা গণতন্ত্রসম্মত নয়। ভুলে যাবেন না, আপনার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানও এ ধরনের পরিস্থিতিতে সেনা তলব করেছিলেন।

www.pathagar.com

কালনাগিণীর ফণা

দেশে আবার হত্যা-সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়ে গেছে। সর্বস্তরের জনগণ খুনী-সন্ত্রাসীদের হাতে এখন অনেকটাই জিম্মি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কখনো অসহায় কখনো বা ব্যর্থ। ফলে শান্তিপ্রিয় জনগণের ভেতর আতঙ্ক এবং উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার, সরকারি দল এবং বিরোধী দল সকলেই হত্যা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার। পুলিশের আইজিও এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত। সম্প্রতি তিনি সন্ত্রাস দমনে পুলিশকে অধিকতর তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। পরিস্থিতির অবনতিই ঘটছে কেবল। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত, বিনিয়োগ-উৎপাদন-উন্নয়ন এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জাতীয় স্বার্থে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ অপরিহার্য।

সত্য কথা বলতে কি, রাজনৈতিক আশ্রয়, প্রশ্রয় এবং পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে দেশব্যাপী হত্যা-সন্ত্রাস এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে না। 'ওপরের' হস্তক্ষেপ না থাকলে এবং পুলিশের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হলে পরিস্থিতি বদলে যেতে বাধ্য। গত ২৭ জুন হোটেল শেরাটনে বিশ্বব্যাংক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চের আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা ও দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক দুদিনব্যাপী সেমিনারের সমাপনী দিনে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি না হওয়ায় রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ সচিব ড. সা'দত হুসাইন একটা বিবেচনাযোগ্য কথা বলেছেন। ড. সা'দত দু'দফা স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন– একবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আরেকবার রাজনৈতিক সরকারের আমলে। একজন আমলার জীবনলব্ধ সকল অভিজ্ঞতাকে কথার তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। তিনি বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো কোনো অপরাধীর নাম উঠলেই আগে প্রশ্ন আসে সে কার ভাই, কার আত্মীয়। ভাই, আত্মীয় ইত্যাদি পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠা যায় না বলেই পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

ড. সা'দত হুসাইনের বক্তব্যের যে অন্তর্নিহিত সুর তা কারো কাম্য হতে পারে না। তাঁর বক্তব্যে আমাদের রাজনৈতিক নেতা, গণ-প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্র ও সমাজের

www.pathagar.com

দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের প্রতি ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ, কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো সন্ত্রাসী অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হলেই রাজনৈতিক চাপাচাপি শুরু হয়। এ চাপ শুধু সরকারি মহল থেকেই নয়, বিরোধী দলের প্রভাবশালী নেতা-নেত্রী এবং সমাজপতিদের তরফ থেকেও আসে। একথাটা অবশ্য সা'দত সাহেব খোলাসা করে বলেননি। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের আচরণই বর্তমানে অধিকতর ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচনা করা যায়। বর্তমান সরকারের কোনো প্রভাবশালী লোক এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখেন না, সবাই একবারে 'ধোয়া তুলসীপাতা' একথা বলবো না। তবে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে খালেদা জিয়ার সরকার যে আন্তরিক একথা বলতেই হবে। সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযানকালে সরকারের এ সম্পর্কিত আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের অংশ হিসাবেই প্রমাণ আছে যে, সেই অভিযানে ক্ষমতাসীন দল ও জোটের লোকজনকেও কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হয়নি, অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়নি। পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে যে, যৌথ অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের শতকরা প্রায় সত্তরজনই ছিলো বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো যে, যে তালিকার ভিত্তিতে তখন অভিযান চলেছিলো, তা প্রণীত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা কালে। অভিযোগ আছে যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলের উদ্দেশ্য নিয়ে কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের দলীয় লোকদের মাধ্যমে সে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো।

জোট সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাস নির্মূলে আন্তরিক ও বদ্ধপরিকর বলেই নানা প্রকার চাপের মুখেও অভিযান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অটল ছিলেন। দলের অনেক নেতা-কর্মী অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ওই অভিযানে খুনী-সন্ত্রাসী-দুর্বৃত্তরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো, অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো আবার অনেকে গা ঢাকা দিয়েছিলো। খুন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ধর্ষণ, লুণ্ঠন বিস্ময়করভাবে থেমে গিয়েছিলো। শাসক দলের কোনো নেতা, সরকারের কোনো মন্ত্রী-এমপি কোনো ব্যক্তির পক্ষে তয়-তদবির করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। বরং বিরোধী দল সে অভিয়ান ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিলো। তাদের কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী ধরা পড়লেই তারা তাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে শোর তুলেছে। তারা এমনও বলেছে, আওয়ামী লীগকে নির্মূল করার জন্যই নাকি যৌথ অভিযান

www.pathagar.com

চালানো হয়েছে। অবৈধ অস্ত্রধারী ক্যাডার যদি দলীয় নেতা-কর্মী হয়, সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে তারা গ্রেফতার হলে রাজনৈতিক হয়রানি বলে যদি চেঁচামেচি করা হয়, তাহলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি করে?

যৌথ অভিযান শেষেও তিন-চার মাস দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে ছিলো। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ফিরে এসে দেশে আত্মগোপনকারী সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের নিয়ে পুনরায় হত্যা-সন্ত্রাসে মেতে ওঠার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আবার অবনতি ঘটতে থাকে। সরকার কঠোরভাবে তা দমনের উদ্যোগ নেয়ার পর আওয়ামী লীগ আবার চেঁচামেচি শুরু করেছে যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ এবং আওয়ামী লীগকে নির্মূল করার জন্যই নাকি সরকার এসব করছে। ইতোমধ্যে এর বিরুদ্ধে তারা নানা রাজনৈতিক কর্মসূচিও পালন করেছে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ পড়ছে। সরকারও বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকারের সৎ উদ্যোগের বিরুদ্ধে আওয়ামীরা বহির্বিশ্বেও অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশনেতাদের কাছে তারা সন্ত্রাস-নৈরাজ্য বিরোধী অভিযানকে আওয়ামী লীগ নির্মূল অভিযান বলে চিত্রিত করে চিঠিপত্রও লিখেছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমেও তারা এ অপপ্রচার চালাচ্ছে। ফলে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে সরকারও মাঝে মাঝে নমনীয় হয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাস আর নির্মূল হচ্ছে না।

ড. সা'দত হুসাইন মৌলিক বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, উদাহরণ হিসাবে দুটি প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। এতে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ আছে। তার একটি উদাহরণ একপেশে, অপরটি অপ্রাসঙ্গিক। তার উদাহরণে আওয়ামী লীগ এবং ভিনদেশের এ দেশীয় একটিভিস্টরা খুশি হবে হয়তো, শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক সকল নাগরিক তাতে সন্তুষ্ট হবে না। তিনি দু'দফা স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। পরিবহন সেক্টরে কারা চাঁদাবাজি করে, যে স্বরাষ্ট্র সচিব তাদের সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন না বা জানেন না, তিনি কি তার দায়িত্বের প্রতি সুবিচার করেন? পুলিশের যে রকম সোর্স থাকে একজন সংসদ সদস্য তো কোনো সচিবের সে রকম সোর্স হতে পারেন না। একজন জনপ্রতিনিধি জনস্বার্থে কোনো বিষয়ের সুরাহার জন্য আইনী কর্তৃপক্ষের কাছে বলতে পারেন, সংশ্লিষ্ট অপরাধী বা অপরাধীদের শনাক্ত করা ও ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তো আইনী কর্তৃপক্ষের। অভিযোগকারীর তালিকাতো

www.pathagar.com

পক্ষপাতদুষ্টও হতে পারে। কোনো একজন সংসদ সদস্য পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজির অভিযোগ করে চাঁদাবাজদের তালিকা সরবরাহ না করে সঠিক কাজ করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সরকারের এতোসব বাহিনী তাহলে কেন আছে? ওই সংসদ সদস্য যদি কোনো দলের হন, ড. সা'দত তার বক্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার দলের লোকরা এই চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত বলেই তিনি চাঁদাবাজদের নাম বলেননি। যাদের আমন্ত্রণে তিনি ভাষণ দিয়েছেন, তারা আওয়ামী বলয়ের লোক। ধারণা করা যায়, তিনি নাম না বলে যে সংসদ সদস্যের উদাহরণ দিয়েছেন, তিনি আওয়ামী লীগার নন। অথচ এটা কে না জানে যে, পরিবহন সেক্টরে আওয়ামী লীগারদের প্রতাপ শাসক দলের চেয়ে কম নয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বক্তব্যে এক পক্ষের ওপর দোষ আরোপিত হয়েছে। তবে এটা সত্য বলছেন যে, এই সেক্টরে ব্যাপক চাঁদাবাজি হয়। এর সঙ্গে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ বাহিনীও জড়িত সে কথা কিন্তু মুখে আনেননি সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব। টোকেন সিস্টেমে পুলিশ কর্তৃক সংগৃহীত বিপুল ঘুষ বা চাঁদা ওপর থেকে নিচে ভাগাভাগি হয় বলেও সাধারণ মানুষের ধারণা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সব চাঁদাবাজকে পাকড়াও করা এবং আইনী ব্যবস্থা নেয়া।

অপর উদাহরণটি সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক এবং তা তার অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়ার কথা নয়। তথ্য সচিব অথবা যিনি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সার্কুলারটি ইস্যু করেছিলেন, তার মুখেই কথাটা মানানসই হতো। এ বক্তব্যটাও তিনি হয়তো বা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য দিয়েছেন। কেননা তাতে তাদের স্বার্থ আছে। তাদের অবস্থান ও স্বার্থানুকূল কথাগুলো সাধারণ্যে এবং উপযুক্ত মহলে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই হয়তো বা তারা ড. হুসাইনকে তাদের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো। সেমিনারের উদ্যোক্তারা মূলত এনজিওজীবী। দ্বিধাবিভক্ত এনজিও শিবিরের যে অংশের তারা প্রতিনিধিত্ব করেন, কাজী ফারুকের নেতৃত্বাধীন সে অংশটি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়, তথাকথিত এক চেতনার নামে জাতিকে বিভক্ত করে বাংলাদেশে আধিপত্যবাদের থাবা বিস্তারের পক্ষে তারা দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে পরাস্ত করতে চায়। বাংলাদেশী জাতীয়তার আদর্শের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে বিজয়ী হতে চায়। এ জন্য দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির আদর্শ প্রচার-প্রসারের মাধ্যমকে দুর্বল এমন কি ধ্বংস করে দিতে চায়। কারণ তারা জানে, আদর্শগত লড়াইয়ে জোটশক্তি টিকে থাকলে আধিপত্যবাদের ক্রীড়নকদের স্বপ্ন কখনও সফল হবে না।

www.pathagar.com

আদর্শ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হচ্ছে মিডিয়া—প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক। আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাদের এ দেশীয় বংশধররা চায়না আমাদের জাতীয় আদর্শ এবং দর্শনের পক্ষে শক্তিশালী প্রচার হোক, তারা চায় না জনগণের মধ্যে এর প্রসার হোক। বিজাতীয় ও দেশের স্বার্থহানিকর আদর্শ, দর্শন, ইতিহাস প্রচার করে তার প্রতি আমাদের জনগণকে আকৃষ্ট, প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে তারা বাংলাদেশের মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সিংহভাগ তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। বছরে ৫/৭ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকা চালানোর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, বাংলাদেশের গণমানুষের 'মগজ ধোলাই' করে এদেশে আধিপত্যবাদের ভয়াল থাবা প্রসারের পথ নিশ্চিত করা এবং এখানে আবার '৭২-৭৫ এবং '৯৬-০১-এর মতো আধিপত্যবাদী শক্তির প্রতি নতজানু একটা পুতুলরাজ কায়েম করা।

লক্ষ্য হাসিলের জন্যই তারা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির সপক্ষের মিডিয়াসমূহ, বিশেষ করে প্রিন্টিং মিডিয়ার ধ্বংস সাধন করতে চায়। আধিপত্যবাদের তাঁবেদারদের জন্য অর্থ কোনো সমস্যা নয়। তাদের অর্থপ্রাপ্তির ভিনদেশী উৎস থাকতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ঘরানার পত্র-পত্রিকার রাজস্ব আয়ের মূল উৎস সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপন। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই তাই। আমাদের দেশের শিল্পায়ন আশানুরূপ নয় বলে প্রাইভেট বিজ্ঞাপন সীমিত। তাই জাতীয়তাবাদী ঘরানার পত্রিকাসমূহকে সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হয়। দেশের ছোট-বড় পত্রিকাগুলো যাতে টিকে থাকতে পারে, সেই উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই জাতীয় বিজ্ঞাপন নীতিমালা প্রণীত। এর ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন হয় এবং সকল পত্রিকাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়। বিজ্ঞাপন বণ্টনে পত্রিকার গুরুত্ব এবং প্রচার সংখ্যা উভয়ই বিবেচিত হয়। তবে যখন যে দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের দলীয় বা জোটের আদর্শ ও দর্শনে বিশ্বাসী পত্রিকাসমূহের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করে। শেখ হাসিনার শাসনকালে লীগপন্থী পত্র-পত্রিকা বেশি সুবিধা ভোগ করেছে, এখন জাতীয়তাবাদী ধারার পত্র-পত্রিকা তা ভোগ করছে। যারা বর্তমান অবস্থার সমালোচনা ও বিরোধিতা করছেন তারা লীগ আমলে একই ব্যবস্থার কোন বিরোধিতা করেননি বরং তা সঠিক মনে করেছিলেন।

www.pathagar.com

এখন তারা সরকারি পুরাতন বিজ্ঞাপন নীতিমালার বিরোধিতাই করছেন না, তাদেরই উদ্যোগে যে সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন সংক্রান্ত একটা সার্কুলার ইস্যু হয়েছিল, তার পক্ষে ড. সা'দত হুসাইনের সাফাই তা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন নীতিমালার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয়েছিলো শহীদ জিয়ার আমলে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংবাদপত্রের মালিক, প্রকাশক, সাংবাদিক-কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের সঙ্গে দীর্ঘ তিন মাস আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছিলো সে নীতিমালা। একজন পদস্থ আমলা কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ ছাড়াই এক কলমের খোঁচায় উল্টে-পাল্টে দিলেন সব? আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার পত্রিকাসমূহ এ ব্যাপারে উল্লাস প্রকাশ করেছিলো। দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তি তথা জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ওই সার্কুলারটি বাতিল হওয়ায় তারা খুবই বেদনাহত।

তারা তাদের অবস্থানের পক্ষে আবার নতুন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। কিন্তু কেবিনেট সচিবের মতো একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এই ক্যাম্পেইনে শামিল হওয়া বাঞ্ছিত নয়। অবসর গ্রহণের পর অথবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর রাজনীতি আপত্তিকর নয়। কিন্তু ড. সা'দত হুসাইন চাকরিরত অবস্থায় কেন এ ভুল করলেন বোঝা মুশকিল।

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

অতীতে কোনো সরকার প্রধান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানকালে নিজের কোনো দুর্বলতা বা সরকারের কোনো বিষয়ে ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন বলে মনে পড়ে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং অন্যদের থেকে আলাদা। জোট সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমেই তিনি স্বীকার করেছেন তার সরকারের দুর্বলতার দিকটি। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, যে পরিমাণে এবং যে দ্রুততার সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে জনগণ আশা করেছিলেন, সেটা হয়নি। এর পরপরই প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতার বিষয়ও বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগও প্রকাশ পেয়েছে ভাষণে। কী পরিমাণ দেশপ্রেম, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা, আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্যের ব্যাপারে দৃঢ়চেতা থাকলে নিজেদের সরকারের কোনো বিষয়ে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করা সম্ভব বেগম খালেদা জিয়াই কেবল তার দৃষ্টান্ত।

সমাজে বা রাষ্ট্রে হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নৈরাজ্য চলতে থাকলে তা ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। মিডিয়ায় যদি তা প্রকাশ নাও পায়, তবু কোনো এলাকায় মানুষের চোখের সামনে ঘটা সন্ত্রাসের খবর দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। তাই ওই ধরনের কোনো ঘটনা লুকিয়ে রাখার প্রয়াস বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। পরে সত্য কথাও মানুষ বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের দুঃশাসনামলে দেশের আনাচে কানাচে পর্যন্ত সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিলো। দেশের অধিকাংশ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ও স্বপক্ষে থাকায় অনেক কাহিনীই প্রকাশ ও প্রচার পায়নি। কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং জনতার কণ্ঠ-বেতারে তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। মূলত আওয়ামী লীগের দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই মানুষ ভোট বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গত বছর পহেলা অক্টোবর। লীগ সমর্থক মিডিয়া আশিভাগ সন্ত্রাসী ঘটনাই চেপে গিয়েছিলো। কিন্তু তাতে তারা গণরোষ থেকে রক্ষা পায়নি।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই এ কারণে যে, তিনি সঠিক কাজটি করেছেন, সত্য প্রকাশ করেছেন। এক বছরে হত্যা, সন্ত্রাস পুরোপুরি কেন দমন করতে পারেননি সে ব্যাপারে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তদ্রূপ। এটা নিষ্ঠুর হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজের কিছু লোকের ভেতর মানবিক গুণাবলি হ্রাস পেয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের চিরন্তন ভালোবাসার টান আর মায়ার মায়াবী আকর্ষণ কিছু লোকের ভেতর অনুপস্থিত। কিছু মানুষের লোভ এখন সীমাহীন, ঈষা দুর্দমনীয় এবং হিংসা ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করায় সমাজে শান্তি অপসৃত হচ্ছে। খুন, ধর্ষণের পৈশাচিক, অমানবিক ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি এটাও লক্ষণীয় যে, সরকারকে হেয় করা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনাও নানা স্থানে ঘটছে, ঘটানো হচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আমদানির সঙ্গে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক যোগসূত্রের খবরও ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যায় জনগণ কনভিন্‌স্‌ড।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সাফল্যের দিকও চিহ্নিত হয়েছে। সরকারের কোনো কাজ জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হলে এবং জনগণ সত্যিকার অর্থে তাতে উপকৃত হলে প্রচার ছাড়াই তা প্রশংসিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে গিয়েছিলো আওয়ামী লীগ। এক্ষেত্রে জোট সরকারের সাফল্য প্রশংসনীয়। একশ' দশ কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু তা সত্য, জোট সরকার তা করেছে। এতে কল্যাণ হয়েছে দেশের, জাতির। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে কি দুর্দশায় নিপতিত করা হয়েছিলো তা বোঝা যায় সেগুলোর তারল্য-সঙ্কটে, চলতি মূলধন যোগান দেয়ার অক্ষমতায়। লীগপন্থী সিবিএ নেতা এবং তাদের সমর্থকদের দাবড়ে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা কাজই করতে পারেনি। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে জোট সরকার। এ ব্যাপারে এক রত্তিও বাড়িয়ে বলেননি প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার এক বছরে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বেশিদিন আগের কথা নয়। লীগ সরকারের পচনের এবং পতনের বছর পাঠ্যবই নিয়ে কী কেলেঙ্কারীই না হয়েছে। লীগ আমলের শিক্ষামন্ত্রী এবং বণিক সালমানের

www.pathagar.com

বেক্সিমকো মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকেরও বেশি খেয়ে ফেলেছিলো। অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এবং মুনাফার টাকা ভাগাভাগি করতে গিয়ে তারা যে 'বই-কেলী'র জন্ম দিয়েছিলো জোট সরকার সেক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই তারা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ঠিক সময়ে বই পৌঁছিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৬৬৩ কোটি টাকার উপবৃত্তি চালু করেছে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানী বন্ধ করে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। এ বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী অতিরঞ্জিত কিছু বলেননি। পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাত, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে এক বছরে সরকারের সাফল্য ও অগ্রগতি নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক। জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যা তার সরকার করতে পেরেছে এবং যা করতে পারেনি, সব মিলিয়ে একটি ভারসাম্যমূলক বক্তব্যই তুলে ধরেছেন। তার এই সত্যভাষণ সমগ্র জাতির জন্যই প্রেরণাদায়ক। সেই প্রেরণায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলুক সরকার, দেশ ও জাতি।

www.pathagar.com

যৌথ অভিযান সফল হোক

দৈনিক দিনকালের ১৮ অক্টোবর সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় একই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর দুটি বক্তব্য সমান্তরালভাবে ছাপানো হয়েছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, ১৭ অক্টোবর সূর্যোদয়ের আগে থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর অভিযানকে সর্বস্তরের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে সমর্থন করছে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হাসান মাশহুদ চৌধুরী সতের তারিখ বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে মোতায়েন করা সেনা সদস্যদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সে সময় জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধীদের ধরতে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শান্তিপ্রিয় দেশবাসী মুগ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে। বগুড়ার সিমাবাড়িতে এক সমাবেশে তিনি বলেছেন, সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়ে সেনাবাহিনী নামিয়েছে। দু'নেত্রীর বক্তব্য থেকে দু'জনের মনোভঙ্গি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

অবৈধ অস্ত্রের খেলা, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য একটি দেশে মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিনাশ করে, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা ধ্বংস করে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটায়। এতে রাষ্ট্রীয় স্থিতি নষ্ট হয়, উৎপাদন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত ও হতাশ হয় এবং বিনিয়োগের গতি শ্লথ হয়ে যায়। দেশ ও জাতি তাতে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থা সভ্য ও গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে সহ্য করা যায় না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত সে পরিস্থিতির অবসান ঘটানো। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন পূর্বতন সরকার দেশকে হত্যা-সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের এক লীলাভূমিতে পরিণত করেছিলো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা সৃষ্টি করেছিলো বহু গডফাদার। তাদের নেতৃত্বাধীন দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে দেশের বহু স্থান পরিচিত হয়েছিলো মৃত্যুর উপত্যকায়। সমগ্র দেশে তারা কায়েম

www.pathagar.com

করেছিলো অনেকটাই 'নিখিল বাংলাদেশ লুটপাট সমিতি'র রাজত্ব। পাঁচ বছরের দুঃশাসনে তারা দেশকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ দেশবাসী তাই ২০০১ সালের ১ অক্টোবর ব্যালট বিপ্লবে তাদের 'গণেশ' উল্টিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রত্যাশা, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার অবস্থা পাল্টে দেবে; মানুষ শান্তিতে, স্বস্তিতে দিন কাটাবে, দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

ভোটের আগে বেগম খালেদা জিয়া জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, সন্ত্রাস দমন হবে তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ। এ উদ্দেশ্যে তিনি জনগণকে সংগঠিত করেছেন এবং শান্তিপূর্ণ ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। অপরদিকে লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে জনবল নয়, নির্ভর করেছেন অস্ত্রবলের ওপর। একদিকে পাঁচ বছর দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে প্রতিপক্ষ দলন করেছেন, অপরদিকে দলীয় দুর্বৃত্তদের 'গায়েবী' নামে 'গায়েবী' ঠিকানায় অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়ে সশস্ত্র করেছেন। হাজার হাজার অস্ত্রের কোন হদিসই নাকি এখন পাওয়া যাচ্ছে না। ওই সকল অস্ত্র এখন অবৈধ বলেই বিবেচনা করতে হবে। ধারণা করা অমূলক নয় যে, অনেক অবৈধ অস্ত্র জায়েজ করার জন্য দলীয় দুর্বৃত্তদের ঢালাওভাবে অস্ত্রের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিলো। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারকে জনগণের কাছে হেয় ও অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে এরাই সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও দুর্বৃত্তদের ধরার জন্য পুলিশ, বিডিআর-এর সঙ্গে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে শেখ হাসিনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপরের বক্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী এক বছরে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও দুর্বৃত্ত দমনে তেমন আশাব্যঞ্জক সাফল্য দেখাতে পারেনি। এ নিয়ে লোকমুখে নানা কথা প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে পুলিশের অসুবিধার কথাও বিবেচনা করা দরকার। দেশব্যাপী সন্ত্রাসী-দুর্বৃত্তদের যে নেটওয়ার্ক, তার মোকাবিলায় পুলিশের সংখ্যাই শুধু অপ্রতুল নয়, তাদের দ্রুতযান সমস্যা, মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তুলনায় দুর্বৃত্তরা অনেক শক্তিধর। তাদের অস্ত্রশস্ত্র অত্যাধুনিক। একে-৪৭ রাইফেল, এম-১৬ রাইফেলের সঙ্গে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে কতটুকু আর সম্ভব? তবে পুলিশ আন্তরিক হলে সন্ত্রাস অনেক কমানো সম্ভব। যদি ধরে নেয়া হয় যে, পুলিশ বাহিনী ব্যর্থ বা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব পালন করছে না, তাহলে যারা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস দমনের পক্ষে তারা তো

www.pathagar.com

এ কাজে দক্ষ ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী মোতায়েন সমর্থন করার কথা। শেখ হাসিনা বা অন্য যারা এর বিরোধিতা করছেন, তাদের উদ্দেশ্য সৎ বলে মনে হয় না।

ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সন্ত্রাসীর কোন দল নেই, সন্ত্রাসী যে দলের হোক, যতো ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক তার নিস্তার নেই। ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। সন্ত্রাসের অভিযোগ পেয়ে দলীয় এমপি, মন্ত্রীপুত্র, এমপি ভ্রাতা কাউকেই তিনি ছাড়েননি। নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পর তারা ছাড়া পেয়েছেন। ১৮ অক্টোবরের সব পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, সেনা অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বিএনপির লোকই বেশি। কিন্তু কারো জন্য কেউ কোন সুপারিশ করেছেন বলে শোনা যায়নি। কিন্তু চমকে উঠেছেন শেখ হাসিনা। আমাদের প্রত্যাশা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, দুর্বৃত্ত গ্রেফতার ও সন্ত্রাস নির্মূলে সেনা অভিযানে প্রকৃত অপরাধীরাই যেনো ধরা পড়ে, নিরীহ, নির্দোষ কেউ যেনো সাজা না পায়। দু'দিনের অভিযানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও টপ টেররদের কেউ কিন্তু এখনো ধরা পড়েনি। আশা করি সেনা সদস্যরা পক্ষপাতহীনভাবে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন। জনগণ তাদের অভিযানকে যেভাবে সানন্দে গ্রহণ করেছে, ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার সময়ও তারা যেনো মানুষের ভালোবাসার ফুল কুড়াতে কুড়াতেই যান। আমরা পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানের সাফল্য কামনা করছি।

www.pathagar.com

লীগের পরিকল্পিত সন্ত্রাস

বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমান বলেছেন যে, 'আওয়ামী লীগ সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এ কার্যকলাপ দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী ষড়যন্ত্রের অংশ'। এটা খুবই সত্য কথা যে, ক্ষমতান্ধ আওয়ামী লীগের কোনো নীতিবোধ নেই। ক্ষমতায় থাকার জন্য কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা তারা করেনি বা করছে না। ক্ষমতার স্বার্থে দলের কর্মী সমর্থককে বলি দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। গত বছর পয়লা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও গদিহারা হওয়ার পর আচরণে উচ্চারণে মনে হয় শেখ হাসিনা ও তার দলের হোমরা-চোমরাদের মাথা বিগড়ে গেছে। ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণায় তারা যেনো ছটফট করছেন। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটাকে সুস্থতার লক্ষণ বলে না।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি ঈর্ষার, প্রতিহিংসার। ওরা নিজের চেয়ে আর কাউকে যোগ্য এবং ভালো মনে করে না। তাদের ভাবখানা এমন যে, তারাই বড়, তারাই সেরা। এ জন্য এই দলটি কখনোই অন্যের প্রতি, বিশেষ করে ভিন্ন মতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেনি, কারো ভালো ও মহৎ কাজের প্রশংসা করেনি। ভলতেয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি– 'তোমার মতের সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমৃত্যু লড়ে যাবো'– গণতন্ত্রের এই মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রতি তারা মোটেও শ্রদ্ধাশীল নয়। মুখে গণতন্ত্রের খৈ ফোটালেও তারা গণতন্ত্রের সর্বনাশ করেছে বারবার। এরা আসলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলনে-নির্মূলে একেবারে হিটলার-মুসোলিনীর ভাবশিষ্য।

অক্টোবরের ভোট বিপ্লবে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বিরুদ্ধে তারা নানা চক্রান্তমূলক তৎপরতা চালাতে থাকে। প্রথমে তারা দেশ-বিদেশের অসংখ্য নির্বাচন পরিদর্শকের ভূয়সী প্রশংসার পরও নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি'র অভিযোগে গণরায় প্রত্যাখ্যান করে ও শপথ নিতে গড়িমসি করে। নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন দেয়ার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ওপর চাপও প্রয়োগ করে। তাদের এই অপতৎপরতার কথা ফাঁস করেছেন স্বয়ং সাবেক প্রেসিডেন্ট। কতটা অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী

www.pathagar.com

হলে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক পন্থায় সম্পন্ন একটি নির্বাচন বাতিলের কথা কেউ বলতে পারে একমাত্র আওয়ামী লীগকে দেখেই তা চেনা ও বোঝা যায়। তাতে ব্যর্থ হয়ে তারা ভিন্ন পন্থায় দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। বিএনপি'র নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরই ছিল দুর্গাপূজা। বদ খেয়ালে তারা দুর্গাপূজা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে। অলীক কাহিনী প্রচার করতে থাকে যে, জোট সরকার দেশের সর্বত্র সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের শেষ করে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের হিন্দুরা দুর্গাপূজা করবে না। দুর্গাপূজা বয়কটের আওয়াজ তুলে সরকারের ভাবমূর্তি বিনাশকল্পে তারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের ঐতিহ্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক জনগণের সচেতনতা ও জোট সরকারের কঠোর ও উপযুক্ত ভূমিকার কারণে তাতেও সফল হয়নি তারা। দেখা গেছে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদও দুর্গাপূজা তদারক করেছেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সিদ্ধান্তে।

এরপরই তারা সরকারকে বিব্রত ও দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। সরকার যাতে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্ত্রাস দমন করতে না পারে, জনগণ যাতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়, সে জন্য তারা রাজধানী ঢাকাসহ কয়েকটি বড় শহরে হত্যা, সন্ত্রাসের রাজনীতি উসকে দেয়। ফলে দেশের গ্রামগঞ্জসহ অধিকাংশ অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এলেও ঢাকাসহ কয়েকটি স্থানে এখনো হত্যা-সন্ত্রাস-নৈরাজ্য রোধ করা যাচ্ছে না। পরিকল্পিতভাবে এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। দেখা যাচ্ছে এ পর্যন্ত ঢাকা এবং তার আশপাশে যে সকল উল্লেখযোগ্য খুনের ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশই রাজনৈতিক এবং শিকার হচ্ছে সব বিএনপির লোক। কিছু নিরীহ লোক ও কচি বাচ্চা অপহরণ ও হত্যা করেও জনমনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তারা। শেখ হাসিনার সহকারী একান্ত সচিব বাহাউদ্দিন নাসিম পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেছে যে, দলের আরো কজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ তারা গাজীপুরে এক সভায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এ ধরনের গর্হিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কোনো রাজনৈতিক দল গ্রহণ করতে পারে, তা কোনো সভ্য ও প্রকৃত গণতন্ত্রী কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ তা পারে। কে এম ওবায়দুর রহমান সে

www.pathagar.com

কথাটাই খোলসা করে বলেছেন। ক্ষমতায় থাকতে প্রতিপক্ষ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে যারা জেলায় জেলায়, স্থানে স্থানে গডফাদার সৃষ্টি করে নির্বিচারে মানুষ খুন করেছে, যে দলের প্রধান নেত্রী একটার বদলে দশটা লাশ ফেলার হুকুম প্রদান করেন, যারা সত্য প্রকাশ করার অপরাধে সাংবাদিকদের পর্যন্ত খুন-জখম করে, হাত-পা ভেঙ্গে নদীতে ফেলে দেয়ার হুমকি দেয় তারা কি যে করতে পারে না তাই বলা মুশকিল।

ক্ষমতার জন্য তারা পাগল হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তাই বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা বিনাশ করে দেশে একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে তারা। আমরা এ পথ পরিহারের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের প্রতি আহবান জানাই। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ভোটে হার-জিত্ আছেই। খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতায় তা গ্রহণ করতে হয়। মনে রাখা দরকার, কোনো সরকারই শেষ সরকার নয়। ভালো কাজ করলে, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হলে আজকের পরাজিতরা আগামীতে বিজয়ীও হতে পারেন। এ জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আমরা আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে ধৈর্য ধারণ এবং তাতে ভালো ফলাফলের জন্য হত্যা ও সন্ত্রাসের পথ পরিহারের অনুরোধ জানাই।

www.pathagar.com

যতো ফুল ততো আশা

গত ১ অক্টোবর ভোট বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ঢাকাসহ জেলায় জেলায় বিএনপি বিজয় মিছিল করেছে। ঢাকায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। সেদিন গণভবনে জনতার উপচেপড়া ভিড় দেখে কারো মনে হতে পারে যে, এদেশে পাগলের সংখ্যা কি এতোই বেড়ে গেলো? দুটো কারণে এমন মনে হতে পারে। প্রথমত, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতোটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে যে, সরকার নিজের লোকদেরও রক্ষা করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, গত বছরের ১ অক্টোবর ভোট বিপ্লবে পরাস্ত আধিপত্যবাদের তাঁবেদার শক্তি লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা বলে বেড়াচ্ছেন, চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়ে মানুষ নাকি এখন তওবা কাটছে। তিনি বলছেন, এই সরকারের প্রতি নাকি জনগণের আর সমর্থন নেই এবং আগামী ১ অক্টোবরের আগেই সরকারের আয়ু খতম। লীগ সমর্থক পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও লীগের সুরে গান গাইছে। এসব দেখে শুনে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে জনতার প্রচণ্ড ভিড় দেখে কারো মনে ওপরের প্রশ্নটির উদয় হতেই পারে।

বর্তমান সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে কেটেছে মাত্র এক বছর। এর মধ্যেই পাঁচ বছরের সব কাজ সম্পন্ন করে ফেলা সম্ভব নয়। যারা সরকারের সমালোচনা করেন, তাদের কেউ কেউ ইতোপূর্বে, কেউবা সদ্য-বিদায়ী সরকারে ছিলেন। তাদের বোঝা উচিত যে, প্রশাসনে রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে সরকারকে সর্বতো সহযোগিতার প্রশ্নে কখনো কখনো অনীহা, দ্বিধাবিভক্তি কখনোবা অসহযোগিতা, দুর্নীতিগ্রস্ততা, নীতি-আদর্শবর্জিত একশ্রেণীর রাজনীতিজীবীর অনৈতিক কার্যকলাপে সংশ্লিষ্টতা এবং সরকারি দলের আবরণে রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করে। এদের কারো কারণে সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, আবার কারো কারণে সরকারের ভাবমূর্তি বিনাশী কিছু তৎপরতা রোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বর্তমান সরকার এই একবছরে অনেক সাফল্য দাবি করতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সাফল্য নিয়ে সরকারতো রীতিমতো গর্ব করতে পারে। এরশাদের মতো শেখ হাসিনাও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রায় ফোক্‌লা করে রেখে গিয়েছিলেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১১০ কোটি মার্কিন ডলার। একবছরে তা তুলে আনা হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি ডলারে– প্রায় দ্বিগুণ। অভাবনীয় সাফল্যই বলতে হবে। এজন্য অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বিশেষভাবে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। সরকারি, আধা-সরকারি ও প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহেও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এই অল্প সময়ে।

'পরীক্ষায় নকল বন্ধের একটি সৎ ও সাহসী উদ্যোগ এ সরকারই নিয়েছে এবং প্রথম বছরেই ভালো ফল পাওয়া গেছে। আগের সরকার ছাত্রদের সমর্থন হারানোর ভয়ে এ ব্যাপারে কোনো রা করেনি। প্রতিবেশী একটি দেশের প্ররোচনাও ছিল। তারা চায় আমাদের দেশের ছেলেরা সার্টিফিকেটধারী হোক, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত না হোক, এতে তাদের দুটো লাভ। প্রথমত, দেশের সার্টিফিকেটধারীরা লেখাপড়ার নিম্নমানের কারণে চাকরি-বাকরীসহ কোথায়ও কোন সুবিধা করতে না পারলে সামাজিক নৈরাজ্য, বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে, এই ধরনের সার্টিফিকেটধারীরা প্রশাসনে ঢুকলে বাংলাদেশের প্রশাসনের মান অধঃপতিত হবে। এ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে বাইরের শক্তির অনেক সুবিধা হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে নকল প্রবণতায় লেখাপড়ার নিম্নমান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাঙ্গামার কারণে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়ে প্রতিবেশীর হাওলায় তুলে দেবেন 'মানুষ করার' জন্য। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়ে দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করতে এখন আর মেয়েদের জন্য অভিভাবকদের কোনো খরচ নেই।

পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণেও বর্তমান সরকারের অবদান প্রশংসনীয়। পরিবেশ দূষণে পলিথিনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন মহল অবগত। পলিথিন মারাত্মক রোগব্যাধি ছড়ায়। নালা-নর্দমায় পলিথিন জমে পয়ঃনিষ্কাশনে বিঘ্ন ঘটায়। নদীর ড্রেজিং-এ অসুবিধা সৃষ্টি করে, জমির উর্বরা শক্তি বিনাশ করে ফসল উৎপাদন কমায়। সব মিলিয়ে পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলে পলিথিন। অথচ এই পলিথিন বন্ধের কোনো উদ্যোগ ইতোপূর্বে নেয়া হয়নি। দু'একবার যাও এ ব্যাপারে আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, উৎপাদক-ফ্যাক্টরী মালিকরা তা ম্যানেজ করে

www.pathagar.com

নিয়েছে। এবার পলিথিন বন্ধের সিদ্ধান্ত অন্তত পাল্টানো যায়নি। তবে ভিন্ন চেহারায় আবার বাজারে কিছু কিছু পলিথিন দেখা যাচ্ছে। তবু পলিথিন বন্ধের সিদ্ধান্তে পরিবেশবাদীরাই বলছেন, এতে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। কালো ধোঁয়ার জন্য ঢাকার রাজপথে বেরুনোই যেতো না। বর্তমান সরকার পুরাতন গাড়ি, বেবী-টেম্পো বন্ধ করে রাজধানীর পরিবেশ অনেকটাই দূষণমুক্ত করেছে। এসব সাফল্য মানুষের চোখে পড়ে। তাই মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন এরই মধ্যে সরকার পূরণ করতে না পারলেও তারা এখনো হতাশ হয়নি, আস্থা হারায়নি সরকারের ওপর। সেজন্য ১ অক্টোবর ভোট বিপ্লব দিবস উপলক্ষে গণভবনে প্রচণ্ড ভিড় জমেছিল মানুষের।

কিন্তু এতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই সরকারের। প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, "যতো ফুল ততো আশা, যতো ভালোবাসা ততো প্রত্যাশা।" সরকারের মাত্র এক বছর গেছে আরো চার বছর আছে কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি পাঁচ বছর সময়কাল থেকে একবছর চলে গেছে এটাও ঠিক। সরকারকে বিবেচনায় নিতে হবে দ্বিতীয়টি। বাকি সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারকে আলোকিত হতে হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে অধিকতর যত্নবান হতে হবে। রাজধানীতে খুন-চাঁদাবাজি মানুষকে উদ্বিগ্ন করছে। এই অল্প কিছুদিনের ভেতর শাসক পক্ষের পাঁচজন নির্বাচিত কমিশনার খুন হয়েছেন। প্রশ্ন তো আসতেই পারে যে, সরকার যেখানে নিজের লোককে রক্ষা করতে পারছে না, সেখানে নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ তাদের ওপর ভরসা রাখবে কি করে? আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করলেই জনগণ সরকারকে মাফ করে দেবে না। বিরোধী দল সরকারকে বিব্রত এবং ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়ার জন্য নানা পথে এগুতে পারে। হত্যা-সন্ত্রাসের পথ গণতন্ত্র সম্মত নয়। এটি জঘন্য ও ফ্যাসিবাদী পন্থা। কেউ যদি সে পথ অনুসরণও করে তা প্রতিরোধ, প্রতিহত করে জনগণকে রক্ষা, তাদের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজতে সরকারকে তার সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে। সন্ত্রাস দমনে নিতে হবে কঠোর পদক্ষেপ। যত সমর্থনই আজ থাক না কেন, কাল সে সমর্থনে ভাটা পড়বে যদি সরকার নিজেকে অক্ষম, অসহায় প্রমাণ করে।

বিএনপি একটি জননন্দিত রাজনৈতিক দল। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ দলে বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ আছে, এ দল ডান, বাম, ধর্মীয়-সকল মতের

www.pathagar.com

মানুষের মিলন মেলা, সকলকে নিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারসাম্যের রাজনীতি চালু করেছিলেন, এ দল একটি মডারেট গণতান্ত্রিক দল। দলের জিয়া-নির্ধারিত এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহাল রাখলে দলটি এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হতে পারে। মাঝে মাঝে মূল অবস্থান থেকে সরে আসার লক্ষণ দেখা দিলেই বিরোধীরা সবল হয়ে ওঠে, বিএনপি 'শেকী' হয়ে যায়। আবার যেই শহীদ জিয়ার অবস্থানে ফিরে যায়, মুক্তিযুদ্ধ, প্রগতিশীলতা, ধর্মীয় চেতনাসহ আমাদের সমগ্র জাতীয় চেতনা দলটিকে অসীম সাহসী এবং শক্তিশালী করে। আমরা আশা করি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্বে তার সরকার ও বিএনপি শহীদ জিয়ার নির্দেশিত পথ ধরে এগিয়ে যাবে এবং জনগণের আশা-প্রত্যাশা পূরণ করে শত্রুর মুখে ছাই দেবে।

www.pathagar.com

চরিত্র হননের রাজনীতি

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক দুটি বেফাঁস মন্তব্য দেশের রাজনৈতিক মহলসহ চিন্তাশীল সকল মানুষকেই বিস্ময়ে হতবাক করেছে। কিছুদিন আগে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী পরিবার দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত সত্তর হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সম্প্রতি বলেছেন, খুলনার আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যার জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয় 'হাওয়া ভবন' থেকে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। শেখ হাসিনা দেশের একজন বড় মাপের নেত্রী। ১৯৮১ সালে নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে চরম কোন্দল, পারস্পরিক যুদ্ধংদেহী বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং আব্দুর রাজ্জাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে ত্রিধাবিভক্ত দলকে জোড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে আপস প্রার্থী হিসাবে তাকে দলীয় সভানেত্রীর পদে বসানো হয়। ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে তৎকালীন কিছু প্রবীণ লীগ নেতা সেই উদ্যোগটি নিয়েছিলেন। যিনি যেভাবেই এই সংগঠনের সভাপতি/সভানেত্রী হোন না কেন, দলটির দেশব্যাপী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ও জনসমর্থনের কারণে আওয়ামী লীগের প্রধান কর্ণধার জাতীয় রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশিষ্ট অবস্থান প্রাপ্ত হন।

একটা দেশে কোনো নেতা বা নেত্রী যখন এ ধরনের অবস্থানে থাকেন, তখন তাকে চলনে-বলনে সংযত হতে হয়, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বিশেষ করে তার জিহ্বাটা। অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, প্রমাণহীন কোনো 'গায়েবী' অভিযোগ তোলা এবং উসকানিমূলক আচরণ করা এই মাপের নেতা-নেত্রীদের জন্য শোভন নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। কেননা, তাদের উস্কানিমূলক দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্যে-মন্তব্যে দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর গুজার করতে হয় যে, বিরোধী দলীয় নেত্রীর কথা দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আমলে নেয়নি এবং যাদের বিরুদ্ধে তিনি একের পর এক অভিযোগ করে চলেছেন, তারাও তার কথা গায়ে মাখছেন না। কিন্তু পায়ের উপর পায়ের চাপ দিয়ে অকারণে ঝগড়া বাধানোর মতো তার এই আচরণ জাতীয় রাজনীতিতে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। রাজনীতিবিদদের এই ধরনের প্রবণতাকে ব্যর্থ ও হতাশ রাজনীতিকের এক ধরনের মানসিক বৈকল্য বলে অভিহিত করা যায়। এতে দেশ ও জাতির অকল্যাণ হয়, জাতীয় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। এই

www.pathagar.com

ধরনের নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত ক্ষতিও হয় অপূরণীয়। তারা জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা হারান। একজন বড় মাপের নেতা কিংবা নেত্রী জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেললে তার আর থাকেটা কি? নির্বাচনে ও আন্দোলনে বারবার পরাজিত ও ব্যর্থ হওয়ার পরও কেন শেখ হাসিনার বোধোদয় হয় না তা বোঝা মুশকিল।

বিরোধী দলীয় নেত্রী কেন এমন আচরণ করছেন তার যে কোনো ব্যাখ্যা নেই তা অবশ্য নয়। ২০০১ সালের অক্টোবর ব্যালট বিপ্লবে ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকেই তার আচরণে ও উচ্চারণে অনেকটা মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ওপর নির্বাচন বাতিল করে দেয়ার জন্য অবৈধ চাপ সৃষ্টি করেন। তার অন্যায় আবদারে কর্ণপাত না করায় তিনি প্রেসিডেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে চারদলীয় জোটের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাতেও কোনো কাজ না হওয়ায় তার দলীয় নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নেবেন না বলে গোঁ ধরেন। অবশেষে দলের এবং বাইরের চাপের মুখে শপথ নেয়ার পরই অবরোধ-হরতালের পথ বেছে নিয়ে নতুন সরকারকে বিব্রত করার কৌশল নেন। দেশ-বিদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অলীক কাহিনী প্রচার করে সরকারের ভাবমূর্তি বিনাশের রাষ্ট্রঘাতী খেলায় মেতে ওঠেন– যা এখনো অব্যাহত রেখেছেন। অষ্টম সংসদ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের জ্বালা ভুলতে পারছেন না বলেই তিনি দেশ ও জাতির কথা না ভেবে খেয়ালী আচরণ করে চলেছেন বলে মনে হয়। অনেকের ধারণা, দেশে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে তিনি এবং তার দলই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষার ধৈর্যও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

জোট সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি– এ কথা সরকার প্রধানও স্বীকার করেন। কেন তা অর্জন করা যাচ্ছে না জনগণও তা বুঝছে। ফলে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বারবার আন্দোলনের ডাক দিয়েও বিরোধী দল জনগণের সমর্থন পাচ্ছে না। মনে হয় এ জন্য তারা খুবই হতাশ। তাই ভাবমূর্তি বিনাশের জন্য তারা এখন সরকারের চরিত্র হননের ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। অবিরাম সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছে। সরকার প্রধান এবং তার পরিবারও তা থেকে বাদ যাচ্ছেন না। তিনি যে প্রধানমন্ত্রী পরিবারের বিরুদ্ধে সত্তর হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনলেন, তার ভিত্তি কি? প্রমাণ কি? প্রকৃত কোনো তথ্য-প্রমাণ থাকলে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই তা জনসম্মুখে হাজির করতেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা

www.pathagar.com

তার পরিবার কেন, যে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভিত্তিহীন, ঢালাও অভিযোগ উত্থাপন করা অনৈতিকই শুধু নয়, আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। আমরা কি শেখ হাসিনাকে এ কথা বলতে পারি না যে, গুরুতর এ অভিযোগের প্রমাণ দিন নতুবা মিথ্যাচারের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তা না হলে সততা ও দেশপ্রেমের পরীক্ষায় বারবার উত্তীর্ণ দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জিয়া পরিবারের চরিত্র হননের কদর্য রাজনীতির সমুচিত জবাব দেশের মানুষ আবার দেবেন আগামী নির্বাচনে।

খুলনাসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল হত্যাকাণ্ড ঘটছে তাতে শুধু আওয়ামী লীগের নয়, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও এর শিকার হচ্ছেন। অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও বাদ যাচ্ছেন না। হাওয়া ভবন থেকে তালিকা প্রস্তুত করে খুলনায় লীগ নেতাদের হত্যা করা হচ্ছে বলে শেখ হাসিনা যে বল্গাহীন অভিযোগ করেছেন, তার পাল্টা একটা প্রশ্ন কি তাকে করা যায় না যে, বিএনপি নেতা-কর্মীদের হত্যার তালিকা তাহলে কোন অফিস বা ভবন থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে? আসলে ওই অঞ্চলে হত্যাকাণ্ডগুলো কারা ঘটাচ্ছে তা শেখ হাসিনারও অজানা নয়। তার শাসনামলেও সেখানে অব্যাহতভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তিনিও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সমস্যাটি আমাদের জাতীয় সমস্যার অন্তর্গত একটি বিষয়। এ সমস্যা সমাধানে একটি জাতীয় উদ্যোগ-আয়োজনের কথা না ভেবে কাউকে দোষারোপ করে সাময়িক রাজনৈতিক ফায়দা হয়তো লাভ করা যেতে পারে, সংকট এতে দূরীভূত হবে না। হত্যার বদলা হত্যা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ নয়, যারা এ সকল অনৈতিক এবং সামাজিক শান্তি, স্থিতি বিনাশী তৎপরতায় লিপ্ত তাদেরকে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার একটা র‍্যাশনাল উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে এবং সে উদ্যোগটা হওয়া উচিত সর্বদলীয় ভিত্তিক। এ ক্ষেত্রে ভালোবাসা, উদারতা এবং ক্ষমার ঔদার্যকে মূল্য দিলে ফলোদয় হতে পারে। এ পথে ফল পাওয়া না গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় আনা যায়। সমস্যা সমাধানে এই ধরনের বা আরো উন্নত, গ্রহণযোগ্য কোনো প্রস্তাব না দিয়ে হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার মনগড়া, হাওয়াই অভিযোগের হেতু সকলের জানা। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিতকরণে তারেক রহমানের নেতৃত্বে হাওয়া ভবনের কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাই ওই কার্যালয়টির ওপর শেখ হাসিনার ক্রোধ সীমাহীন। হাওয়া ভবনে কর্মরত দলীয় কর্মীরা শেখ হাসিনাকে তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানালে কি করবেন শেখ হাসিনা? এতো বড় নেত্রীকে উপদেশ দেয়ার ধৃষ্টতা আমরা দেখাতে পারি না; তবে সবিনয়ে বলি, রাজনীতিকে রাজনীতি

www.pathagar.com

দিয়ে, ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচিকে আরো উন্নত কর্মসূচি দিয়ে মোকাবিলা করুন। তাতে আপনার, আপনার দলের, সর্বোপরি দেশ ও জাতির মঙ্গল হবে। সে পথেই পুনরায় আপনি ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতে পারেন, অন্য কোনো কদর্য পথে নয়।

বিরোধী দলের আচরণ জনগণ প্রত্যক্ষ করছে। '৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে লীগ সরকারের কার্যক্রমে, অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়েই অষ্টম সংসদ নির্বাচনে আম-জনতা নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে। নির্বাচনের আগে বিএনপি তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সন্ত্রাস দমন এবং জনগণের জানমালের হেফাজত করার যে অঙ্গীকার করেছিল, মানুষ তা বিশ্বাস করেছিল এবং পরম আস্থায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষে তাদের নিরঙ্কুশ রায় ঘোষণা করেছিল। বিএনপিকে একাই সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন উপহার দিয়েছিল এদেশের ভোটার সাধারণ। সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে বিএনপি তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অঙ্গীকার করেছিল– "এই লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথার্থই প্রশিক্ষিত, যোগ্য, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। এদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হবে এবং অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের সকল উৎস বন্ধ করা হবে। অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে আইন চলবে নিজস্ব ও স্বাভাবিক গতিতে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী থানায় এজাহার নেয়া নিশ্চিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রভাব কিংবা সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ , এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক জেলায় বিশেষ আদালত স্থাপন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে। সমাজের সকল স্তরে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে এবং পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সময়োপযোগী ও অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।"

স্বীকার করতে হবে, বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে। খুনী-সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের দমনের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত বিচার আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারার্থে আইনের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। লীগ সরকারের আমলে ছিনতাই, রাহাজানি, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের

www.pathagar.com

জন্য নির্যাতন, নারী ধর্ষণ যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এ ব্যাপারে সরকার অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এখনো জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না সরকার। ইতোমধ্যে হত্যা-সন্ত্রাসের বেশ কিছু মামলার বিচার হয়েছে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। অনেককে ফাঁসির দণ্ডও দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি দণ্ডও কার্যকর হয়নি। এ ব্যাপারে আইনী ব্যবস্থাটা ত্বরিত গৃহীত হলে হত্যা-সন্ত্রাস কমবে বলে আশা করা যায়। সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সরকার 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামে যে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছিল, তার ফলাফল ছিল আশাব্যঞ্জক। সে সময় কোনো মন্ত্রীও হস্তক্ষেপ করেননি বা করতে পারেননি। এখন সমালোচনা হচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ হস্তক্ষেপ করছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ কেউও এ সুযোগ গ্রহণ করছে। ফলে পরিস্থিতি আবার পাল্টে যেতে শুরু করেছে। রাজনীতি করার জন্য গণসমর্থিত কোনো দলের মাস্তান-নির্ভরতার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সকল দায়িত্বশীল নেতা মাস্তানদের আশকারা না দিলে সন্ত্রাস দমন খুব একটা কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যুগোপযোগী, সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করলে এ ক্ষেত্রেও সরকার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। তখন শেখ হাসিনা 'উদোর-পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর সুযোগ পাবেন না। তার চরিত্র হননের রাজনীতিও ব্যর্থ হবে।

একটা কথা সত্য বলেই মনে হয় যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বিরোধী দল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হত্যা-সন্ত্রাসের পেছনে কোথাও তাদের হাত, কোথাওবা উসকানির প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রতিপক্ষকে বিব্রত ও জনগণের সামনে হেয় করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের এই ধরনের হীন তৎপরতার বহু প্রমাণ অতীত ঘাঁটলে অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং জোট সরকারের শরীক সকল দল 'পরিচ্ছন্ন' হয়ে হত্যা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হতে বাধ্য। সেই ধরনের কোন সৎ উদ্যোগকে জনগণও সমর্থন করে। যেমন জানিয়েছিল 'অপরারেশন ক্লিন হার্ট'কে। শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের চরিত্র হননের রাজনীতির এটাই হবে উপযুক্ত জবাব।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাসহ দেশের তিনটি আলোচিত ও জনচিত্ত আলোড়িত প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ রাজনীতিকরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে। অথচ, সবকটি অভিযোগই সর্বৈব মিথ্যা। ২৬ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তার কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। মুজিবের স্বকণ্ঠ কোনো ঘোষণাও নেই। বলা হয়ে থাকে, একাত্তর সালের ৭ মার্চই শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ শেখ মুজিব নিজে বলেছেন, সেদিন তিনি স্বাধীনতার কোনো ঘোষণা দেননি। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ সাংবাদিক ডিভিড ফ্রস্টকে নিউইয়র্কের ডব্লিউএনডব্লিউ টিভির জন্য দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেছেন, সেদিন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। ফ্রস্ট তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার কি ইচ্ছা ছিল যে, ৭ মার্চ রেসকোর্সে আপনি স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেবেন?' মুজিব বলেছিলেন 'আমি জানতাম এর পরিণতি কি হবে। আমি বলি যে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির ও স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ফ্রস্ট তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আপনি যদি বলতেন, আজ আমি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দিচ্ছি, তাহলে কি ঘটতো'। জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'বিশেষ করে ওই দিনটিতে আমি তা করতে চাইনি।'

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও বলেছেন, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। ১৯৭১ সালের ৬ নবেম্বর নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, "....This other country has pushed accorss the border people who did not vote for their government but voted for the regime they wanted. There was no other crime which these people have committed, because the cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He himself. so far as I know, has not asked for independence, even now." ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এ বক্তৃতাংশ লিপিবদ্ধ করা আছে।

অপরদিকে জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তার বহু অকাট্য প্রমাণ আছে। দুটি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি। প্রবাসী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "লড়াইরত আমাদের বাহিনীর চমৎকার সাফল্য এবং তাদের শক্তির সঙ্গে প্রতিদিন জনবল বৃদ্ধি ও দখলীকৃত অস্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে - যা প্রথম মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে ঘোষিত হয়-সক্ষম করেছে পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল বেস প্রতিষ্ঠা করতে যেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।" ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট জিয়া রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সঞ্জিব রেড্ডী ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় বলেন; "Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave freedom fighter, Who was the first to declare the independence of Bangladesh. অধ্যাপক শামসুল হকের Bangladesh in international politics-P 96)। এতেই প্রমাণ হয় প্রতিপক্ষের বক্তব্য কতো অসার।

এবার মার্শাল ল' জারি করে ক্ষমতা দখলের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৭৫ সালের ৭ নবেম্বরের সিপাহী-জনতার অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফের পতনের পর ঘটনার অনিবার্যতা জিয়াউর রহমানকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। তিনি জোর করে ক্ষমতা নেননি, সিপাহী জনতা তাঁর ওপর দায়িত্ব অপর্ণ করে। মার্শাল ল' জারি হয় জিয়া আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসার আগে। মার্শাল ল' জারি করেছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। জিয়াউর রহমান খোন্দকার মোশতাকের জারি করা সে মার্শাল ল'ই পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। খোন্দকার মোশতাকই যে সামরিক আইন জারি করেছিলেন তা ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মধ্যেই স্পষ্ট। অধ্যাদেশের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, "...কোনো প্রতিরক্ষা সার্ভিস সংক্রান্ত যে কোনো আইনসহ সাময়িকভাবে বলবৎ এমন যে কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ভোর বেলায় সম্পাদিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তন এবং সামরিক আইন ঘোষণার প্রসঙ্গে বা এ পরিবর্তন এবং ঘোষণার জন্য কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বা এ পরিবর্তন এবং ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পন্ন কোন কাজকর্ম, বিষয় বা ঘটনার জন্য বা কারণে বা প্রসঙ্গে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট ও কোর্ট মার্শালসহ কোনো আদালতের বা কর্তৃপক্ষের সমীপে বা নিকটে বা দ্বারা কোনো মামলা, অভিশংসন বা

www.pathagar.com

অন্য আইনগত বা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হবে না বা গৃহীত হবে না।" কাজেই জিয়া সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেছেন অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

১৯৭৫ সালের ৩ নবেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাক সরকারের পতন ঘটে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াকে বন্দী করে অভ্যুত্থানকারীরা। ৬ নবেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকেন। ৭ নবেম্বর ৭৫ সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে খালেদ-অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটে এবং বন্দী জিয়া মুক্ত হন ও পুনরায় সেনাপ্রধানের দায়িত্বে বহাল হন। ৭৫ এর নবেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত জেনারেল জিয়া উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। কোন সেনা প্রধান মার্শাল'ল জারি করে একজন সিভিলিয়নকে চীফ মার্শাল'ল' এডমিনিস্ট্রেটর (সি এম এল এ) বানিয়ে নিজে তার ডেপুটি হয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই। তা ছাড়া সায়েম যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জিয়া তখন খালেদের হাতে সে সময় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন প্রেসিডেন্ট সায়েম-যিনি ৬ নবেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিয়ার বন্দীদশায়। এ থেকেও প্রমাণ হয়, দেশে সামরিক আইন জারির দায় জিয়াউর রহমানের নয়, তাঁর পূর্বসূরির। ১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং তার প্রতি জাতির আস্থা এবং বিশ্বাস যাচাই করে নেন গণভোটের মাধ্যমে। এরপর ১৯৭৮ সালে তিনি প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম গণনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দল বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই সংসদেই একদলীয় বাকশাল প্রথা উচ্ছেদ করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক প্রথা চালু হয় সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে। কাজেই দৃঢ়তার সঙ্গেই এ কথা বলা যায় যে, শহীদ জিয়া সামরিক একনায়ক ছিলেন না, তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের তৃতীয় অভিযোগটিও সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বাংলাদেশের সকল বৈধ নাগরিকের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন মাত্র। দেশ ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতির স্বার্থে তিনি সমন্বয়ের রাজনীতি, ঐক্য ও সমঝোতার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর দলের জন্য সে পথনির্দেশ রেখে গেছেন। তাঁর প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আওয়ামী লীগসহ সকলেই রাজনীতি করার সুযোগ ভোগ

www.pathagar.com

করছে। জিয়াউর রহমান যখন দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তখন আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার রাজাকারদের রাজনীতি করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। শেখ মুজিবই তার জীবদ্দশায় তাদের রাজনীতি করার বা পুনর্বাসনের পথে সকল বাধা অপসারণ করে গেছেন ১৯৭২ সালের ৩০ নবেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে। সেই ঘোষণায় বলা হয়, "সরকার বাংলাদেশ দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ - ১৯৭২ বলে যারা আটক হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা অথবা হুলিয়া রয়েছে এবং যারা এই আইনে সাজা ভোগ করছেন তাদের সকলের প্রতিই এই সাধারণ ক্ষমা প্রযুক্ত হবে এবং তারা অবিলম্বে মুক্তি লাভ করবেন।"

এ উপলক্ষে ৭২ সালের ৩০ নবেম্বর রাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "দলমত নির্বিশেষে সকলেই যাতে আমাদের মহান জাতীয় দিবস ১৬ ডিসেম্বরে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে পারে সরকার সেজন্য দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছে। তিনি আরো বলেন, বহু রক্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা আর চোখের পানির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি।... স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছু লোক দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে বিরোধিতা করেছিল। পরে বাংলাদেশ দালাল আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই পরিচিত ব্যক্তি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ -দুর্দশা নেমে এসেছিল। এসব লোক দীর্ঘদিন ধরে আটক রয়েছেন। এতদিনে তারা নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুতপ্ত। তারা নিশ্চয়ই তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনায় রয়েছেন। মুক্তি লাভের পর তারা তাদের সকল অতীত কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশ গঠনের নতুন শপথ নিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।" (দৈনিক বাংলা, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)।

বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭২ বাতিলপূর্বক তৎকালীন মুজিব সরকারের সাধারণ ঘোষণা পাঠ এবং ৭২-এর ৩০ নবেম্বর রাতে শেখ মুজিবের বক্তব্য শোনার পর শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়? যাদের তারা এখন আবার কখনো বলছেন দালাল, কখনো বলছেন রাজাকার, এদের সমাজে, রাষ্ট্রে এবং রাজনীতিতে পুনর্বাসন যদি দূষণীয় হয়, সে দোষ কার—জিয়াউর রহমানের না শেখ মুজিবের?

www.pathagar.com

জিয়া ঃ মরণ যাকে জাতির কাছে আরো আপন করেছে

এক

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৮১ সালের ৬ জুন হংকং থেকে প্রকাশিত 'ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ' মন্তব্য করেছিলো, "ঠিক যেনো জুলিয়াস সীজারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ঘনিষ্ঠজনদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি চট্টগ্রাম চলে গেলেন তাঁর করুণ ভাগ্যকে বরণ করার জন্য। তাঁকে জানানো হয়েছিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কমান্ডার জেনারেল মঞ্জুর তাঁর ওপর রুষ্ট। সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা জিয়া সে কথা শোনেননি। তিনি সাবধানকারীদের বলেছেন, "ও আমাকে চট্টগ্রামে হত্যা করবে কেন? তাতে তো সে ক্ষমতা পাবে না।" তিনি চলে গেলেন হীমশীতল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য। নিয়তির কি পরিহাস, তাঁর বক্তব্যই সত্য হলো। জেনারেল মঞ্জুর ক্ষমতা পাননি।"

জুলিয়াস সিজার ছিলেন একজন অসীম সাহসী বীর। রোমের এই মহান দেশপ্রেমিক বীরের নাম অনেকেই জানেন। তাঁর ভাগ্যেও জুটেছিল করুণ পরিণতি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাসসহ অন্যান্য চক্রান্তকারী সিনেট সভায় সংবর্ধনার কথা বলে তাঁকে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আগের রাতে তাঁর স্ত্রী কালফোর্নিয়া একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সীজারকে সিনেট সভায় যেতে বারণ করে বলেছিলেন, "তুমি যেওনা সিনেট সভায়।" কিন্তু মহাবীর সীজার তা শোনেননি। তিনিও বলেছিলেন, "আমাকে হত্যা করে ওদের কি লাভ?" যথার্থ ছিল তাঁর কথা। ব্রুটাসরা রোমের ক্ষমতা দখল করতে পারেনি।

দুই

জিয়া ভাগ্যের বরপুত্র ছিলেন না। জাতীয় ক্রান্তিকালে ধূমকেতুর মতো তাঁর উদয় ও সাহসী উত্থান। একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী যখন এদেশের অপ্রস্তুত, অসংগঠিত ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতারা সকলেই তখন পালিয়ে যান ভারতে। শেখ মুজিবুর রহমান আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে। ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তখন গর্জে ওঠেন সময়ের সাহসী সন্তান জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ইথারের স্রোতে স্রোতে ভেসে আসে এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর–"আমি মেজর জিয়া বলছি...। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

www.pathagar.com

বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।" জিয়াউর রহমানের স্ব-কণ্ঠ স্বাধীনতার ঘোষণাটি চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম তাঁর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি 'ওরা এগার জন' এবং 'সংগ্রাম'-এ ব্যবহার করেছিলেন। মুজিব আমলে কৌশলে তা ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়। সেই মূল ঘোষণাটি চাষী নজরুল ইসলাম আবারো তাঁর ডকুমেন্টারী ছবি 'দেশ, জাতি জিয়াউর রহমান'-এ ব্যবহার করেন। জিয়া সেই ঘোষণায় বলেছেন, "I Major Zia as supreme commender of Bangladesh liberaton force and provissional head of the state do hereby declare the independence of Bangladesh." (আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের সুপ্রীম কমান্ডার ও প্রভিশনাল রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি ...) প্রথম সে ঘোষণায় তিনি আরো বলেন, "I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh. (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ঃ তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা-২, প্রকাশকঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়)।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি ইতিহাসের অন্তর্গত বিষয়। বাংলাদেশে এখনো অসংখ্য লোক বেঁচে আছেন, যাঁরা স্ব-কর্ণে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। তারা বলে শেখ মুজিবই নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কারো সমালোচনা না করে পাঠকদের সামনে তিনটি ঐতিহাসিক মন্তব্য তুলে ধরতে চাই।

(১) তাজউদ্দিন আহমদ ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জনগণের উদ্দেশে প্রথম যে ভাষণ দেন তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শেখ মুজিব নয়, জিয়াউর রহমানই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর ভাষণে বলেন, "... লড়াইরত আমাদের বাহিনীর চমৎকার সাফল্য এবং প্রতিদিন তাদের শক্তির সঙ্গে জনবল বৃদ্ধি এবং দখলীকৃত অস্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে—যা মেজর জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে প্রথম ঘোষিত হয়— সক্ষম করেছে পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল বেস প্রতিষ্ঠা করতে, যেখান থেকে মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।" যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে গ্লোরিফাই করে তিনি আরো বলেন, "চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধ

www.pathagar.com

ব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলের ভাই - বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা করছেন, স্বাধীনতার ইতিহাসে এই প্রতিরোধ 'স্টালিনগ্রাডের' পাশে স্থান পাবে" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, প্রকাশক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।

(২) ইন্দিরা গান্ধী ঃ শেখ মুজিব যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, সে সত্যটি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যেও স্পষ্ট হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৬ নবেম্বর নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, "... This other country has pushed accross the border people who did not vote for their government, but voted for the regime they wanted. There was no other crime which these people have committed, because the cry for independence arose, after Shaikh Mujib was arrested and not before. He himself, so far as I know has not asked for independence, even now."

অর্থাৎ, এই অন্য দেশটি সেই জনগণকে সীমান্তের এপাড়ে ঠেলে দিয়েছে, যারা তাদের সরকারের পক্ষে ভোট না দিয়ে নিজেদের পছন্দের লোককে ভোট দিয়েছে। তারা অন্য কোনো অপরাধ করেনি। স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পর– তার আগে নয়। আমার জানামতে, এমন কি এখন পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতার কথা বলেননি। (ভারতের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা-৬০৭)

(৩) সঞ্জীব রেড্ডি ঃ ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গিয়েছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর তাঁর সম্মানে দেয়া এক রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব রেড্ডি বলেন, "...your positon is already assured in the annals of the history of your country as a brave freedom fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh."

(বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনার স্থান ইতিমধ্যেই আপনার দেশের ইতিহাসের পাতায় নির্ধারিত হয়ে গেছে।)

[অধ্যাপক শামসুল হকের Bangladesh in international politics, p-96)।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর পরই আওয়ামী লীগ নেতারা জনগণকে তোপের মুখে ফেলে রেখে একে একে ভাগতে থাকেন। তারা সকলেই পাড়ি জমান ভারতে। শেখ মুজিবেরও তাদের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। সহকর্মীদের সঙ্গে না গিয়ে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার বরণ করেন। এ প্রসঙ্গে মাসুদুল হক তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ 'বাঙালী হত্যাকাণ্ড ও পাকিস্তানের ভাঙন'-এ ভারতীয় সাংবাদিক জ্যোতি সেন গুপ্তের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, সে মজার কাহিনী শুনুন। "আগের রাতে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ গোয়েন্দা সূত্র আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার কথা জানিয়ে দেয়। জেনারেল ওসমানী ধানমণ্ডির বাসভবনে আসেন শেখের সাথে দেখা করতে এবং তাঁকে একই খবর দেন। শেষ রাত পর্যন্ত করণীয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তাঁরা আত্মগোপন করবেন এবং পালিয়ে ভারতে চলে যাবেন। সেই অনুযায়ী ২৫ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাজউদ্দিন এসে দেখেন, তিনি তাঁর বিছানাপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। মুজিব তাঁকে বললেন, তিনি থেকে যাবেন, গ্রেফতার বরণ করবেন।

শেখ মুজিবের ভারতে না যাওয়ার কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায় ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলোচনা থেকে। মাসুদুল হক তাঁর উল্লিখিত বইয়ে জি, ডব্লিউ, চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার দিন চারেক আগে শেখ মুজিবকে লয়ালপুর জেল থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে বিএফএলএ ভবনে আনা হয়। কড়া প্রহরাবেষ্টিত এই ভবনে এলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য তিনি দু'দিন আসেন এই ভবনে। তাদের আলাপচারিতার পুরোটাই টেপবন্দী হয়ে যায়। মুজিব ভুট্টোকে বলেছিলেন, "আমি বাড়িতেই ছিলাম। যা ঘটছিলো তার সবই জানতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি পালাইনি। কি জন্য? কেবলমাত্র দেশকে রক্ষার জন্য"।

ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর সত্যতা মেলে প্রথিতযশা সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের লেখায়। তিনি লিখেছেন, "... তিনি অতি সংগোপনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে একটি পরীক্ষামূলক সমঝোতায় আসার মনোভাব পোষণ করছিলেন, যার বদৌলতে পাকিস্তান ও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের মধ্যে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হবে। আমি এ দুঃখজনক পরিকল্পনার ইঙ্গিত পেয়ে মর্মাহত হলাম। কারণ, তা ছিলো স্বাধীনচেতা বাংলাদেশীর মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ওই ইঙ্গিতটি শেখ মুজিবের ভাষায়, 'তোমার জন্য একটা বিরাট খবর নিয়ে এসেছি। আমরা

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখতে চাচ্ছি। তবে এর বেশি কিছু তোমাকে এখনই বলতে পারছি না। ... আর খোদার দোহাই, এ বিষয়ে তোমাকে বিস্তারিত বলার আগে কিছু লিখো না কিন্তু" (এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের 'এ লিগ্যাসী অব ব্লাড"-এর অনুবাদ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮)।

ইদানীং আওয়ামী লীগের কেউ কেউ বলেন '৭১ সালের ৭ মার্চই শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। অথচ ৮ মার্চ '৭১ দৈনিক ইত্তেফাক আট কলাম হেডিং দিয়েছিল, "সংসদে যাওয়ার প্রশ্নে শেখ মুজিবের ৪ দফা। দফাগুলো ছিলো- (১) সামরিক আইন-মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, (২) সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভেতর ঢোকাতে হবে, (৩) যেসব ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে, (৪) জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।' বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা তাতে ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে ২২ মার্চ রাতেও তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কোন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?" (পূর্বদেশ, ২৩ মার্চ '৭১)।

২৫ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, এটা সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট। তাই যদি দেবেন সেদিন তিনি ২৭ মার্চ হরতালের ডাক দিয়েছিলেন কেন? ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ পাকিস্তান টাইমস্ -এ সেই হরতালের আহবান ছাপানো হয়। তাতে বলা হয়, "Sheikh Mujibur Rahman yesterday gave a call for a general strike throughout East Pakistan on March 27 as a mark of protest against the army firing upon the civilian population in Sayedpur, Rangpur and Joydevpur."

এর অর্থ কি? ২৫ তারিখ তিনি যদি স্বাধীনতাই ঘোষণা করে থাকেন তো ২৭ তারিখ হরতাল ডেকেছিলেন কেন? তাঁর তো যুদ্ধের ডাক দেয়ার কথা - যেমন দিয়েছিলেন 'মেজর' জিয়াউর রহমান।

চার

একটা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা বা সিপাহসালার মৃত্যুবরণ করতে পারেন, আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। আত্মগোপন করতে পারেন, স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে ধরা দিতে পারেন না। শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নেতার কিংবা সেনাপতির কোনো দায়িত্বই পালন করেননি। ঐতিহাসিক সে দায়িত্ব পালন করেছেন জিয়াউর রহমান। তিনি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি, যুদ্ধ সংগঠিত করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং নিজে বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে

www.pathagar.com

'জেড ফোর্সের' ভূমিকা ও অবদান কোনোদিন ম্লান হওয়ার নয়। যুদ্ধ শেষে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ব্যারাকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির আরেক ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে ইতিহাস আবার তাঁর ওপর অর্পণ করে নতুন আরেক দায়িত্ব-দেশ গড়ার দায়িত্ব।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাকশাল ও শেখ মুজিবের পতন ঘটে। ক্ষমতায় আসীন হন শেখ মুজিবেরই ঘনিষ্ঠজন, আওয়ামী বাকশালের প্রবীণ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুশতাক সরকারের পতন ঘটায়। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে সকল দেশপ্রেমিকের বুক। খালেদের অভ্যুত্থানে উল্লসিত হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ। তাঁর মা, ভাই এবং মস্কোপন্থী মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে মিছিল বেরোয় এবং সে মিছিল গিয়ে শোকের মাতম তোলে মরহুম শেখ মুজিবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে। তাতেই খালেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় সৈনিক-জনতার মধ্যে। জিয়া তখন খালেদের হাতে বন্দী, অথচ তিনি ছিলেন খালেদ মোশাররফের বস, চীফ অব আর্মি। ঘটনা দ্রুত মোড় নিতে থাকে। ৭ নভেম্বর ঘটে সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান। সে অভ্যুত্থান জিয়াউর রহমানকে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। সৈনিকরা বন্দী জিয়াকে মুক্ত করে। এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস ৭ নভেম্বরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "... উল্লসিত কিছু সৈনিক আর বেসামরিক লোক নিয়ে কতগুলো ট্যাংক ঢাকা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। এবার ঐ ট্যাংক দেখে লোকজন ভয়ে না পালিয়ে ট্যাংকের সৈনিকদের সাথে একাত্ম হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। তিনদিন ধরে তারা মনে করছিলো যে, খালেদ মোশাররফকে দিয়ে ভারত তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা খর্ব করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এতক্ষণে তাদের সেই দুঃস্বপ্ন কেটে গেলো। জনতা সৈনিকদেরকে তাদের ত্রাণকর্তা বলে অভিনন্দিত করে। রাস্তায় নেমে সারা রাতভর তারা শ্লোগান দিতে থাকে, 'আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গণজাগরণের মতো জনমত আবার জেগে উঠেছে। সেটা ছিলো সত্যিই একটা স্মরণীয় রাত' (লিগ্যাসী অব ব্লাড-এর অনুবাদ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২২)।

সিপাহী-জনতার আহবানে জিয়াউর রহমান এবার দেশের হাল ধরেন। ওরা বলে, জিয়া সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। অথচ তা সর্বৈব

www.pathagar.com

মিথ্যা। ম্যাসকারেনহাসের বর্ণনা থেকেও তা পরিষ্কার। জিয়াউর রহমান সামরিক আইন পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সামরিক আইন জারি করেন খোন্দকার মুশতাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। খোন্দকার মুশতাক আহমদই যে সামরিক আইন জারি করেন তার উল্লেখ আছে ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ঘোষণায়। তাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভোরবেলায় সাধিত ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং সামরিক আইন ঘোষণার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, মাহমুদ শফিক, পৃষ্ঠা-১০৬)। খালেদ মোশাররফ তা অব্যাহত রাখেন। ৬ নভেম্বর '৭৫ বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১০-১১-৭৫ থেকে ২০-৪-৭৭ পর্যন্ত জিয়া ছিলেন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। জিয়াউর রহমান যে সামরিক আইন জারি করেননি, এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে!

পাঁচ

১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে শুরু হয় জিয়াউর রহমানের নতুন অভিযাত্রা। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রত্যয় ঘোষণা করেন তিনি। সেই ঘোষণা অনুযায়ী সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়, বাকশালের পরিবর্তে চালু হয় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আবার রাষ্ট্রীয় স্থিতি ফিরে আসে। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। আওয়ামী লীগও তাতে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রার্থী ছিলেন জেনারেল ওসমানী। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে লাভ করে ৩৮টি আসন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় জিয়াউর রহমানের নন্দিত উত্থান ছিল আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কার্যত জনগণের উত্থান ও বিজয়। তাঁর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলে সম্মুখপানে। কিন্তু আমাদের এই জাতীয় অগ্রযাত্রা অনেকের ভালো লাগেনি। জিয়াউর রহমান পরিণত হন তাদের টার্গেটে। ১৯৮১ সালের ৩০মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ঘাতকের বুলেটে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ভারতের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সানডে '৮৪ সালে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, "জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' -এর হাত ছিল। মুজিব হত্যার বদলা নেয়ার জন্য 'র' জিয়া হত্যার পরিকল্পনা করে। জনতা দলের সাবেক একজন এমপি সুব্রাহ্মনিয়াম স্বামী ওই পত্রিকাকে বলেন, শেখ

www.pathagar.com

মুজিবের হত্যাকাণ্ডে ক্রোধান্বিত হয়ে 'র' প্রধান কাও এবং শংকর নায়ার জিয়া হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হলে শংকর নায়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বিষয়টি ব্রিফ করেন। দেশাই পরিকল্পনাটি শুনে হতবাক হয়ে যান এবং তা বাতিল করেন।"

১৯৮৪ সালের ২৩-২৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলী অব ইন্ডিয়া'ও একই তথ্য প্রকাশ কর।

উল্লেখ্য, এর পরের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর জিয়াউর রহমান নিহত হন। তাঁর হত্যাকাণ্ডে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে সারা দেশে, নিন্দা আর ধিক্কারের ঝড় ওঠে সারা বিশ্বে।

শহীদ জিয়া আজ নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শের শিখা আজো অনির্বান। মরণ তাকে জাতির কাছে আরো আপন করেছে। তাঁর হাতে উড্ডীন জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের পতাকা আজো সমানে উড়ছে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে। এ পতাকা উড়ছে, উড়বে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিনাশী কোনো চক্রান্তই এদেশে কামিয়াব হবে না।

www.pathagar.com

একুশের বিশ্বমর্যাদা

ওরা বলেছিল, মাকে মা বলে ডাকতে দেবে না। কিন্তু আমরা ডেকেছি। ওরা চেয়েছিল মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে, আমরা প্রতিহত করেছি। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি পশুশক্তির বুলেটে ঝরা আমার ভাইয়ের রক্তের বুদবুদেই ফুঠেছে মাতৃভাষা বাংলার সুরভিত ফুল। এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সংগ্রাম সংক্ষুব্ধ মানুষ লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত করেছে মাতৃভাষার সম্মান।

সংগ্রামে উদ্বেল, চেতনায় ভাস্কর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। দুহাজার এক সাল থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ এ দিবসটি উদযাপন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২০০০ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিস অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের ১শ' ৮৮টি দেশ এই সংস্থার সদস্য।

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে কিছু শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমসীমা নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলির শিকার হন এবং কয়েকজন শ্রমিক তাতে প্রাণ হারান। তাদের সেই আত্মদানের ফলেই সারা দুনিয়ায় শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রম নির্ধারিত হয়। ১ মে স্বীকৃতি পায় আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস হিসাবে। সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী ১ মে উদযাপন করে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে আমেরিকার সেই আত্মত্যাগী বীরদের, যারা নিজেদের জীবন দিয়ে সারাবিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে নতুন জীবন দিয়েছেন।

সারাবিশ্বের মানুষ যখন ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করে তারাও উচ্চারণ করে বাংলাদেশের নাম, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বলে-শাবাশ বরকত, জব্বার, সালাম। ভাষার জন্য বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের আত্মদান ও বীরত্বগাথা স্মরণ করে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার শপথ নেয় পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ।

একুশে ফেব্রুয়ারির এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান সমগ্র বাংলাদেশ এবং দেশবাসীর জন্য এক দুর্লভ সম্মান। মাতৃভাষার জন্য এমন আত্মদান, জীবনদান

www.pathagar.com

পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষ করেনি। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবাংলার জনগণ বাংলাভাষা নিয়ে বড়াই করলেও এ ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সাহসী কোনো ভূমিকা আজো রাখতে পারেনি। আমাদের দেশের কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবাংলাকেই বাংলাভাষার 'আধার' জ্ঞানে অজ্ঞান হলেও আজ পৃথিবী স্বীকার করছে—লড়াই করে, রক্ত দিয়ে, প্রাণোৎসর্গ করে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার একক কৃতিত্ব এবং অপার গৌরব একুশে ফেব্রুয়ারির, এই অহঙ্কার একমাত্র বাংলাদেশের।

মাতৃভাষার প্রতি মমতা জন্মভূমির প্রতি প্রতিটি মানুষের ভালোবাসাকে প্রগাঢ় করে। জন্ম দেয় স্বজাত্যবোধ। আর এই স্বজাত্যবোধই একজন নাগরিককে খাঁটি দেশপ্রেমিকে পরিণত করে, স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জন ও সংরক্ষণে অনুপ্রাণিত ও সাহসী করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য গভীর। একুশে ফেব্রুয়ারির লড়াই শুধু আমাদের ভাষার লড়াই ছিল না। একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল একটি জাতির আত্ম-আবিষ্কারের দিন। উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্বোধনের দিন এই একুশে ফেব্রুয়ারি। এ কথা যথার্থই বলা হয় যে, একুশে ফেব্রুয়ারিই হচ্ছে আমাদের মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চের অঙ্কুর।

ভাষা হচ্ছে জাতি গঠনের একটি শক্তিশালী উপাদান। এই উপাদান যদি বিনাশ হয়, একটি জাতির ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হয় তাতে। ভাষা একটি জাতির আশা, স্বপ্ন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার বিকাশ দাবিয়ে রেখে একটি জাতির বিনাশ সাধনের অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের মাতৃভাষারও টুটি চেপে ধরা হয়েছিল পাকিস্তান আমলে।

পাকিস্তানের এককেন্দ্রিক বিজাতীয় শাসক-শোষকগোষ্ঠী আমাদের কণ্ঠ থেকে মায়ের ভাষা বাংলাভাষা কেড়ে নিয়ে কণ্ঠনালিতে ঢোকাতে চেয়েছিল উর্দু বোল, বিজাতীয় ভাষা। বাংলাভাষার বুকে পাষাণ আঘাত হেনে তারা আমাদের প্রিয় জন্মভূমির চিরায়ত সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। আমাদের জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী ধারণার সম্ভাব্য উত্থান ঠেকিয়ে চিরদিন গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে এই ভূখণ্ডের জনগণের মাতৃভাষার ওপর তারা বর্গীর মতো হামলা চালিয়েছিল। জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত রেখে বিজাতীয় শাসন-শোষণের ধারা অটুট রাখার উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছিল বাংলাভাষার ওপর। একুশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানিদের

www.pathagar.com

সেই চক্রান্তের বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষার মর্যাদা, উত্থান হয়েছে নতুন এক জাতিসত্তার। ভাষা টিকে যাওয়াই টিকে গেছে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। একাত্তরে এই সকল উপাদানের সঙ্গে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ, ধর্ম-বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র পতাকার উপাদান যুক্ত হ'য়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। একুশে ফেব্রুয়ারিই আমাদের পৌছিয়ে দিয়েছে ছাব্বিশে মার্চে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে যার যার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণে আমাদের মতোই প্রেরণা-সুধা আহরণ করবে-এটা আমাদের সকলের গৌরব, জাতীয় অহঙ্কার। এই সুযোগে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম প্রস্তাবকারী বাংলাদেশের সুনাগরিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবক কানাডীয় সংস্থা, কানাডার সরকার ও জনগণের প্রতি আমাদের সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। আমাদের দেশ ও জাতি এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে যে গৌরবের আসন পেল সেজন্য ইউনেস্কোও ধন্যবাদার্হ। কারো করুণায় নয়, রক্ত দিয়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা যেমন আমাদের অলঙ্ঘনীয় অধিকার ঠিক তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদের শোনিত ধারায় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনও আমাদের জাতীয় অহঙ্কার।

www.pathagar.com

হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচি উস্কানিমূলক

গত ৭ ও ৮ এপ্রিল আহূত হরতাল চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ৩০ এপ্রিল 'সরকার পতনের' ডেডলাইন বেঁধে দিয়ে যে ভুল তারা করেছেন তা ঢাকতে গিয়ে আরো বড় ভুলে জড়িয়ে পড়ছেন। ৮ এপ্রিল রাতে অনুষ্ঠিত লীগ-সভায় এবার তারা 'হাওয়া ভবন' ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে অনিয়মতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন। সংঘাত, সংঘর্ষ ও নৈরাজ্যের পথ উসকে দিচ্ছেন তারা। 'হাওয়া ভবন' ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে লীগ নেতা-নেত্রীরা গণতান্ত্রিক মুখোশের অন্তরালে ঢাকা তাদের প্রকৃত বীভৎস রূপটাই প্রকাশ করে ফেলেছেন।

'হাওয়া ভবন' কোনো সরকারি অফিস-দফতর নয়। এটি বিএনপি চেয়ারপার্সনের দলীয় কার্যালয়। বিরোধী দলের জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলন হয় ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে, কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়। কোনো প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের অফিস ঘেরাও, অবরোধ, হামলা বাংলাদেশ সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।' সংগঠন করার এই সাংবিধানিক স্বাধীনতা এবং সংগঠনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক অফিস ব্যবহার বিএনপিসহ যেকোনো প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের অলঙ্ঘনীয় অধিকার। এক সংগঠনের এই অধিকার ভোগের ওপর অপর সংগঠনের হস্তক্ষেপ সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের শামিল। আওয়ামী লীগ একের পর এক তাই করে চলেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অষ্টম সংসদ নির্বাচনে গ্লানিকর পরাজয়ের জ্বালা লীগ-সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এতটাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলেছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে ছড়ানো তার প্রতিহিংসার অনল এখন সমগ্র দেশ এবং গোটা জাতিকে স্পর্শ করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের পেছনে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ইন্ধন আছে বলে জনগণের সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের ধারণা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের নানামুখী উদ্যোগ ও প্রয়াসকে ব্যর্থ করে সরকারকে ডিফেইম করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের সামর্থ্যের ওপর জনগণকে আস্থাহীন করার কুমতলবে তারা অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন স্থানে হত্যা-সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে। শিক্ষক, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন নির্দয় খুনের শিকার হওয়ার ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কোনো একটি রাজনৈতিক অপশক্তি বিভিন্ন পেশার মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামানোর জন্য উত্তেজিত করার লক্ষ্যেই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। নিরীহ মানুষের রক্তে কেউ যেন তার ক্ষমতার সিঁড়ি নির্মাণ করতে চাইছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট তো ক্ষমতায়ই আছে। তাই সন্দেহটা স্বাভাবিকভাবেই গিয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের ওপর।

আওয়ামী লীগ সরকার 'হঠানোর' এক দফা আন্দোলনে নেমেছে। সংসদে না গিয়ে, সরকারকে অনাস্থা ভোটে পরাস্ত করার চেষ্টা না করে রাজপথের আন্দোলন-হরতাল দিয়ে তা কী করে সম্ভব সে রহস্য বোঝা মুশকিল। জাতীয় সংসদের ৩০০ সদস্যের মধ্যে ২১৯ জনের সমর্থনপুষ্ট জোট সরকারকে মাত্র ৫৮ জন সদস্য নিয়ে যে আওয়ামী লীগ আনসীট করতে পারবে না, তা স্কুলের বালক-বালিকারাও বোঝে। বিএনপি কর্তৃক পরিত্যক্ত শেখ হাসিনার বি-টিমের খেলোয়াড় ডাক্তার বদরুদ্দোজার 'বোলিং-এ যে আর কোনো সরকারদলীয় 'উইকেটের' পতন হবে না তাও ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ ৩০ এপ্রিল পেরিয়ে যেতে এর বেশিদিন বাকি নেই। তাহলে কোন শক্তিতে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার 'ফেলে' দিতে চায় আওয়ামী লীগ? বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, তা পেশীশক্তি, অবৈধ অস্ত্রশক্তি। যে কারণে জনগণ গত ১ এপ্রিল চট্টগ্রামে আটককৃত ১০ ট্রাক অবৈধ অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতা আছ বলে মনে করছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ভেতর একটা কমন অপিনিয়ন ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে। এ ঘটনা আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তিতে ধস নামিয়ে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ তাই এখন দিশেহারা। দলের মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মীরা দারুণভাবে হতাশ। নেতা নেত্রীদের ওপর তারা ক্ষুব্ধও। তাদের অভিযোগ, ক্ষমতার পাঁচ বছরে মন্ত্রী, এমপি, নেতারা ভাই বেরাদর, শালা-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন, দলের অন্যদের কথা

www.pathagar.com

ভাবেননি। তাই আন্দোলন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। ৩০ এপ্রিল 'সরকার পতনের' ঘোষণা দিয়ে আবার একটি 'নিখিল বাংলাদেশ লুটপাট সমিতির' রাজত্ব কায়েমের যে স্বপ্ন ছড়ানো হয়েছিল, ৭ ও ৮ এপ্রিল চরমভাবে ফ্লপ হরতাল সে স্বপ্নও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এতে নেতা-নেত্রীরাও হতাশ।

মরিয়া হয়ে আওয়ামী লীগ তাই প্রত্যক্ষ সংঘাত, সংঘর্ষে নামার দলীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দল নানা কর্মসূচি পালন করেছে। সরকার কোনো কর্মসূচিতে বাধা দেয়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মসূচি বানচালের জন্য মাঠ দখলের নামে দলীয় ক্যাডারদের সশস্ত্রভাবে মাঠে নামাতো। পুলিশের সঙ্গে তারাও হামলে পড়তো বিরোধী দলের মিটিং-মিছিলের ওপর। কিন্তু বিএনপি এবং তার জোট শরীকরা এ ব্যাপারে ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়ে আসছে। আওয়ামী লীগ এখন উসকানি দিয়ে তাদের মাঠে নামাতে চায়। হাওয়া ভবন ঘেরাও করার অনৈতিক দলীয় সিদ্ধান্ত সে কারণেই তারা নিয়েছে। তারা চায় বিএনপিও আওয়ামী লীগ অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করুক। এ ধরনের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে। শুরু হবে দলের সঙ্গে দলের সংঘর্ষ। আওয়ামী লীগ তেমন একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই উসকে দিতে চাচ্ছে। তা না হলে হাওয়া ভবন তো বিএনপির একটা অফিস, সে অফিস ঘেরাও'র কর্মসূচি আন্দোলনের কর্মসূচি হয় কী করে? পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, আন্দোলনের নয়, আওয়ামী লীগ এখন চাচ্ছে একটা মারামারির কর্মসূচি।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের এই কার্যালয়টির ভূমিকা শেখ হাসিনা এখনো ভোলেননি। তাই যতো আক্রোশ হাওয়া ভবনের ওপর। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে তাই এই অফিসটি অকার্যকর করে দিতে চান হাসিনা। তারা এই অফিসকে বিতর্কিত করার বহু চেষ্টা করেছেন। এখন নিয়েছেন আঘাত হানার কর্মসূচি। এই অফিসের সঙ্গে বিএনপির হাজার-লক্ষ তরুণ নেতা কর্মীর একটি আবেগতাড়িত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা লীগ নেতৃত্বও জানে। বিএনপিতে তারুণ্যের এই অপরাজেয় শক্তিকে ধ্বংস করার এবং এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধাবস্থার মতো একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ এই ঘৃণ্য পথে পা দিয়েছে। কিন্তু এ পথও তাদের জন্য আত্মঘাতী হবে। আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কেরিয়ার রাজনীতিবিদদের উচিত

www.pathagar.com

ছিল এ ধরনের সংঘাত সৃষ্টিকারী অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক কর্মসূচি প্রণয়নে বাধা দেয়া। কিন্তু তারা তা করেননি। তারা যাই করুন, বিএনপির উচিত হবে সকল প্রকার উসকানির মুখেও সংযত আচরণ করে গণতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। অতীতের মতো এবারেও যদি বিএনপি হ্যান্ডলিং-এ ভুল না করে, তা হলে আওয়ামী লীগের শেষ আশার বেলুনটিও ফুটো হয়ে যেতে বাধ্য।

------ ০ ------

www.pathagar.com

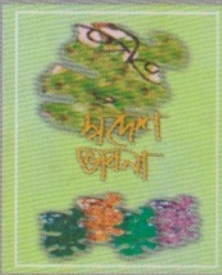

ISBN 984 8613 89-7
9 789848 613894